মাসুদ রানা

চারিদিকে শত্রু-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬

এক

হ্যাঙ্গারে কি হচ্ছে ও জানে না।

দোতলায়, পাইলটদের রেস্ট রূমে আধঘণ্টা হলো পায়চারি করছে মাসুদ রানা। কারও সাহায্য ছাড়া লে. কর্নেল বেনিনের প্রেশার স্যুটটা পরতে গলদঘর্ম হতে হয়েছে ওকে। লেসগুলো ঠিকমত বাঁধতে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল ও। জি-ফোর্সের সর্বনাশা বিপদ থেকে এই লেসিং-ই রক্ষা করবে ওকে। প্লেনে মেকানিক্যাল কোন ত্রুটি থাকলে ও বাঁচবে না, সেই রকম লেসিঙেও যদি কোন ত্রুটি থাকে অসহায়ভাবে ঢলে পড়তে হবে মৃত্যুর কোলে। প্রেশার স্যুট পরার সময় মিনিট পনেরোর জন্যে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ও। ব্লিপারটা বগলের নিচে থেকে বের করে শোল্ডার-পকেটে রেখেছে। কান দুটো খাড়া ওর, সময় ঘনিয়ে এসেছে, যে-কোন মুহূর্তে শুনতে পাবে পিপ পিপ।

কোইভিসতু কি বলেছিল মনে আছে। পিপ পিপ আওয়াজ হলে মনে করবে হ্যাঙ্গারে তোমার ডাক পড়েছে। পায়চারি না থামিয়েই পরে থাকা হেলমেটে একবার হাত বুলাল ও, হাতের বাড়ি দিয়ে ভাইজরটা নামিয়ে মুখ ঢাকল। অস্থিরতা দূর করার

জন্যে ঘরের ভেতর হাঁটাহাঁটি করছে ও। ফ্লাইটের আগে লে. কর্নেল বেনিনও নাকি এই রকম পায়চারি করে।

শেষ মুহূর্তে কেউ এসে পড়তে পারে।

পোড়া একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। হ্যাঙ্গারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কোইভিসতু আর তার সহকারীরা।

এইবার! যে-কোন মুহূর্তে পিপ পিপ শোনা যাবে।

হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। করিডরে অনেকগুলো বুট জুতোর আওয়াজ। হেঁটে নয়, দৌড়ে আসছে কয়েকজন গার্ড। গার্ড? নাকি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসার?

এই বিল্ডিঙে একজন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসার ঢুকেছে, কিন্তু বেরিয়ে যায়নি। অন্তত পাঁচজন লোক এখানে ঢুকতে দেখেছে ওকে। তিনজন গার্ড, বিলিয়ারস্কের সিকিউরিটি চীফ কর্নেল সাসকিন আর চীফ সিকিউরিটি অফিসার মেজর রাভিক। হঠাৎ ওদের টনক নড়েছে? নাকি কোইভিসতু আর তার সহকারীদের গ্রেফতার করে তথ্য আদায় করেছে ওরা?

কারা আসছে? কেন?

পায়চারি থামাল না, হাত দুটো প্রেশার স্যুটের দুই পকেটে। একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে অটোমেটিকটা। দরকার হলে পকেট থেকে ওটা বের না করেই ট্রিগার টানতে পারবে। মনে মনে প্রার্থনা করল ও, তার যেন দরকার না হয়। অটোমেটিকে সাইলেন্সার নেই।

ঘরের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ইউনিফর্ম পরা লোক। ঘরের মাঝখানে রানা, গ্রীবা উঁচু করে থমকে দাঁড়াল ও। দু'জনের হাতে অটোমেটিক কারবাইন, একজনের হাতে রিভলভার। দু'জন সাধারণ সৈনিক, একজন ক্যাপ্টেন।

নিঃশব্দে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। দৌড়ে আসায় বা উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।

'কি চাই?' ভাইজরের ভেতর থেকে রানার কণ্ঠস্বর ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল।

'একজন ক্যাপ্টেনকে খুঁজছি আমরা,' রুদ্ধশ্বাসে বলল রিভলভারধারী। 'এই বিল্ডিঙে ঢুকেছে, কিন্তু বেরিয়ে যায়নি। আপনি তাকে দেখেছেন, কর্নেল?'

পিপ পিপ–প্রতি সেকেন্ডে এক জোড়া শব্দ–পিপ পিপ! হ্যাঙ্গারে যাবার ডাক এসে গেছে। মনে মনে অস্থিরতা অনুভব করল রানা। পোড়া গন্ধটা বাড়ছে।

'কমরেড, ফ্লাইটের আগে আমি ঠিক স্বাভাবিক মানুষ থাকি না,' বলল রানা। 'তাছাড়া, কে এল কে গেল সেটা দেখা আমার কাজ নয়। এই বিল্ডিং রাক্ষুসে মাছ নয় যে তোমার মত একজন চুনো-পুঁটি ক্যাপ্টেনকে গিলে ফেলবে। দেখো হয়তো কোথাও বসে ঘুমাচ্ছে!'

ক্যাপ্টেনের চেহারা লাল হয়ে উঠল। কিন্তু অপমানটা বিনা প্রতিবাদে হজম করল সে। ফ্লাইটের আগে লে. কর্নেল বেনিনের মানসিক অবস্থা কি হয়, জানা আছে তার। বলল, 'লোকটা আসলে, কমরেড, ভুয়া পরিচয় দিয়ে প্রজেক্ট এলাকার ভেতর ঢুকে পড়েছে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে দিমিত্রি অদরিক নামে কেউ নেই, অথচ গেটের গার্ডকে সে ওই নামের একটা কার্ড দেখিয়ে ভেতরে ঢুকেছে...'

'কতক্ষণ আগে?'

'তা প্রায় ঘণ্টা তিনেক তো হবেই।'

রাগে ফেটে পড়ল রানা। 'এই তোমাদের কাজের নমুনা? তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে...এতক্ষণ কি তোমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে?'

'জ্বী...না, মানে মেজর রাভিক তাকে দেখেছিলেন, কিন্তু চিনতে পারেননি। হঠাৎ এই একটু আগে তাঁর মনে হয়েছে,

লোকটার চেহারা আগে কখনও দেখেননি তিনি। ফাইল চেক করতে গিয়ে আসল ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে—ওই নামের কোন লোক...'

'বুঝলাম,' কর্কশ সুরে বলল রানা। 'লোকটা তাহলে কে? কি তার উদ্দেশ্য?'

'সে একজন বিদেশী এজেন্ট, কমরেড,' ঢোক গিলে বলল ক্যাপ্টেন। 'সম্ভবত ইসরায়েলি। উদ্দেশ্য খুব খারাপ—মিগ-৩১ স্যাবোটাজ করার জন্যেই...'

'অথচ এখনও তোমরা আমার সাথে গল্প করছ?' প্রায় মারমুখো হয়ে তেড়ে এল রানা। 'ভাগো, যাও এখান থেকে, অকর্মার দল! বেরোও!'

পিছিয়ে গেল তিনজনই, পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এই সময় করিডরে আরও বুটের আওয়াজ হলো। পাঁচ-সাত জন গার্ডকে দেখা গেল দরজার সামনে। ভেতরে না ঢুকে উঁকি দিয়ে প্রেশার স্যুট পরা পাইলটকে দেখল তারা, তারপর আবার করিডর ধরে ছুটল।

'আমরা এই রেস্ট-রুম সার্চ করতে এসেছি, কমরেড কর্নেল,' আমতা আমতা করে বলল ক্যাপ্টেন। 'বলা তো যায় না...'

বিপদ টের পেল রানা। হ্যাঙ্গারে যাবার ডাক আসছে, কিন্তু এরা এখানে উপস্থিত থাকতে ঘর থেকে বেরুতে পারবে না ও। ফ্লাইটের অফিশিয়াল সময় এখনও হয়নি। মিথ্যে কোন অজুহাত দেখিয়ে যদি নিচে নামতে চায় ও, ওরা সন্দেহ করবে। আবার, ওরা যদি ঘর সার্চ করে, লকারগুলো নিশ্চই খুলে দেখবে।

লে. কর্নেল বেনিন রয়েছে একটা লকারে।

'রেস্ট-রুম সার্চ করবে?' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'কেন? বললাম না, আমি কাউকে দেখিনি এখানে?'

পিপ পিপ—চলে এসো রানা।

'কমরেড কর্নেল, লোকটা আপনার আগে এই বিল্ডিঙে ঢুকেছে,' বলল ক্যাপ্টেন। তাকে সমর্থন করে মাথা ঝাঁকাল গার্ড দু'জন। 'আমরা লকারগুলো খুলে দেখব, হয়তো একটার ভেতর লুকিয়ে আছে।'

করিডরে আবার বুটের আওয়াজ। আমি একা, ভাবল রানা, ওরা তিনজন–গুলির আওয়াজ হলে করিডর থেকে ওরা সবাই রাইফেল উঁচিয়ে ভেতরে ঢুকবে।

পিপ–পিপ দেরি হয়ে যাচ্ছে, রানা।

'লকারে ভেতর থেকে তালা দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই,' বলল রানা। 'হাতল ধরে টেনে দেখো, কোন্‌টা খোলা।'

'চাবি নিয়ে এসেছি, কমরেড,' বলল ক্যাপ্টেন, ভাইজারে ঢাকা রানার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে। 'সবগুলো লকার খুলে দেখব আমরা।' থামল সে, যেন রানা কোন প্রশ্ন করবে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু রানা চুপ করে আছে দেখে আবার বলল, 'ভুয়া ক্যাপ্টেনের সহযোগী কেউ থাকতে পারে–হয়তো আমাদেরই কোন লোক সে। অদরিক লকারে ঢোকার পর সহযোগী হয়তো বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়েছে–পরে সময় মত তালা খুলে তাকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেবে।'

পিপ পিপ–চলে এসো, চলে এসো!

তীরে এসে তরী ডুববে? বিপদ কাটাবার কোন উপায় দেখছে না রানা। জোরে জোরে নাক টানল ও। 'কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি, ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঙ্গারে ওরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, কমরেড,' বলল ক্যাপ্টেন।

'ওরা?'

'তিন বেঈমান।'

এক পা সামনে এগোল রানা। 'মিগ-৩১?'

'আগুন নেভাবার চেষ্টা চলছে...পিপি টু-কে হয়তো শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে না।'

'আমাকে তাহলে যেতে হয়,' অস্থির দেখাল রানাকে। দরজার দিকে এগোল ও।

ঠিক পথ রোধ করল না, তবে ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলে ক্যাপ্টেন বাধা দিল রানাকে। 'ব্যস্ত হবেন না, কমরেড। পিপি ওয়ানের কাছ থেকে আগুন অনেক দূরে। কোন আশঙ্কা দেখা দিলে ওটাকে নিরাপদ জায়গায় সরাবার অনেক লোক আছে ওখানে। তাছাড়া, আমরা সার্চ করার সময় এখানে আপনার থাকা দরকার।'

'কোথায় আমার থাকা দরকার সেটা তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে না,' বলে দরজার দিকে আবার এগোল রানা। এছাড়া আর কোন উপায় খোলা নেই। ওরা এখন ওকে বাধা দিতে পারে, দিলে পাল্টা আঘাত হানতে হবে। ক্যাপ্টেনকে পাশ কাটাবার সময় মৃদু একটু ধাক্কা দিতে হলো, কারণ রানার পথ থেকে এক চুল সরল না সে। লোকগুলোকে ছাড়িয়ে এল রানা, শরীরের সমস্ত পেশী টান টান হয়ে আছে। দু'সেকেন্ডের মধ্যে কামরা থেকে বেরিয়ে যাবে ও, কিংবা বাধা পাবে।

দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল রানা।

ক্যাপ্টেন আর গার্ড দু'জন ঘুরে গেছে, রানার মাথার পিছনে তাকিয়ে আছে তারা। ক্যাপ্টেন ইতস্তত করছে, হাতের রিভলভার রানার পিঠ লক্ষ্য করে ধরা।

বেরিয়ে যাবে রানা, এই সময় বাধা। একজন গার্ড ছুটে এল, কামরায় ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা খেলো রানার সাথে। লোকটা হাঁপাচ্ছে। 'কর্নেল বেনিন, হ্যাঙ্গারে আপনাকে দরকার! আগুন নেভানো যাচ্ছে না!'

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?' জেরা করার সুরে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'মেজর বাস্কি।'

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল রানা। 'তোমার নামে আমি অভিযোগ করব, ক্যাপ্টেন। তুমি আমার সাথে বেয়াদপি করেছ।' গার্ডকে পাশ কাটিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা, ছুটল সিঁড়ির দিকে। নতুন গার্ড পিছু নিল।

যেন কোন নিঃশব্দ ইঙ্গিত পেয়ে দুই ইহুদির কাছ থেকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগল সব লোকজন। নিঃসঙ্গ, আলাদা হয়ে পড়ল ওরা। না থাকল লুকাবার জায়গা, না কোন আড়াল। আধখানা চাঁদের আকৃতি নিয়ে সৈনিকদের একটা দল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। হ্যাঙ্গারের ভেতর ধোঁয়া, চোখ ডলছে সবাই, খক খক করে কাশছে। সরাসরি আগুন থেকে সিলিঙের দিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া, তারপর নামতে শুরু করে খোলা দরজার দিকে ভেসে যাচ্ছে। আগুন এখনও নেভেনি, আরও দুটো তেলের ড্রাম বিস্ফোরিত হওয়ায় তার বিস্তৃতি প্রায় নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তবে পিপি টু-কে রক্ষা করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন। লাউড হেইলারের আড়ালে ঢাকা পড়েছে মেজর রাভিকের মুখ, তার কর্কশ, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বাকি সব আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে।

'হাতের অস্ত্র ফেলে দিন। এখুনি! তা না হলে গুলি করার নির্দেশ দেব আমি। ফেলে দিন, হাতের অস্ত্র ফেলে দিন...'

কি-ই বা আর করার আছে, ভাবল করনিচয়। পাশে দাঁড়ানো কোইভিসতুর দিকে তাকাল সে। হ্যাঙ্গারের খোলা দরজার দিকে উদ্বেগ আর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে কোইভিসতু। তার সমগ্র অস্তিত্ব থেকে বিস্ফোরিত হচ্ছে একটা প্রশ্ন, কোথায় পিটি?

কোথায়? কোথায়?

প্রথমটার সাথে আরও একটা ফায়ার টেন্ডার যোগ দিয়েছে। দমকল কর্মীরা এয়ারক্রাফট আর হ্যাঙ্গারের মেঝে ঢেকে দিচ্ছে ফোম দিয়ে। এরই মধ্যে ইসরাফিলভের গায়ের আগুন নিভিয়ে ফেলেছে তারা। কিন্তু পুড়তে আর কিছু বাকি নেই তার। মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধে বমি আসে।

দুই ইহুদির চারপাশে এখন অনেক লোক, এখনও তারা ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে। কারও পরনে সাদা কোট, কেউ ওভারঅল পরে আছে। এরা সবাই টেকনিশিয়ান আর বিজ্ঞানী। বাকি সবাই কে.জি.বি. আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স গার্ড। তারা পিছু হটছে না, এগিয়ে আসছে। কোইভিসতু আর করনিচয়ের পিছনে দমকল কর্মীরা ব্যস্ত, সামনে অর্ধবৃত্ত আকৃতি নিয়ে সৈনিকের দল।

কোইভিসতু অনুভব করল, আগুনের আঁচ কমে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখল দ্বিতীয় মিগের তলায় এখন আর আগুন নেই, ফোম ছিটিয়ে নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রথম মিগ-কে ঘিরে থাকা সৈনিকের দলটা সংখ্যায় এখন কমে গেছে, কর্নেল সাসকিনের নির্দেশে হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে গেছে কিছু লোক। এর মানে কি? পিটি ডাভের অনুপ্রবেশ টের পেয়ে গেছে ওরা? খোঁজা হচ্ছে ওকে?

কোথায় সে? দশ মিনিট হয়ে গেল খুদে ট্র্যান্সমিটারের বোতাম টিপে দিয়েছে ও, বোতাম টেপার তিন মিনিটের মধ্যে হ্যাঙ্গারে চলে আসার কথা তার। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে যদি না আসে, তারপর এলেও এয়ারকিঙের ককপিটে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। তাকে আর করনিচয়কে খুন করার পর সৈনিকের দলটা ফিরে যাবে পিপি ওয়ানকে পাহারা দেয়ার জন্যে।

নিভু নিভু আগুনের আলোয় লালচে আভা বিকিরণ করছে প্লেনের রূপালি গা। কোইভিসতুর আশা পূরণ হয়নি, দ্বিতীয়

মিগের ফুয়েল ট্যাংকে আগুন লাগেনি। পিটি ডাভের দুর্ভাগ্য, দ্বিতীয় মিগ উড়তে পারবে।

'হাতের অস্ত্র ফেলে দিন। তা না হলে আমি গুলি করার নির্দেশ দেব।'

করনিচয়ের হাতে গর্জে উঠল অটোমেটিক। অর্ধ-বৃত্তের মাঝখানে একটা ফাঁক দেখা গেল, বুকে গুলি খেয়ে পড়ে গেল একজন সৈনিক। পরমুহূর্তে কান ফাটানো বিস্ফোরণ। একসাথে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। কোইভিসতুর পাশ থেকে কেউ যেন ছোঁ দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল করনিচয়কে। অটোমেটিক ধরা হাতটা সামনে লম্বা করে দিল কোইভিসতু। চোখ বুজল। তারপর ট্রিগার টানতে লাগল।

একটা ধাক্কা। পরমুহূর্তে মেঝের ওপর, করনিচয়ের পাশে পড়ল কোইভিসতু। হাঁটুর ওপর থেকে গলা পর্যন্ত তার ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মাথাটা পড়েছে করনিচয়ের বুকের ওপর, ফলে হ্যাঙ্গারের খোলা দরজাটা পরিষ্কার দেখতে পেল সে। চারদিকে নেচে উঠল সৈনিকরা, তুমুল হর্ষধ্বনি শোনা গেল।

চোখ বুজে আসছে। সৈনিকদের উল্লাস তার কানে পৌঁছুচ্ছে না। আধবোজা চোখে হ্যাঙ্গারের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে কোইভিসতু। মারা যাচ্ছে সে। কিন্তু শেষ মুহূর্তেও আশা, দরজায় দেখতে পাবে পিটি ডাভকে।

বিশাল দরজায় একটা ছায়া দেখা গেল। প্রেশার স্যুট পরা একটা ছায়া। তৃপ্তির ক্ষীণ হাসি ঠোঁটে নিয়ে মারা গেল কোইভিসতু।

দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল গার্ড, রানাকে বলল, 'ভেতরে ঢুকে দেখুন, মেজর বাস্কিকে পেয়ে যাবেন। আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে উনি ওদিকেই গেছেন।'

তবু দাঁড়িয়ে থাকল রানা। হ্যাঙ্গারের শেষ প্রান্তে এখনও

আগুন জ্বলছে। ফায়ার টেন্ডার দুটো দেখতে পেল ও, দেখতে পেল ফোমে ঢাকা দ্বিতীয় মিগটাকে। ওটাকে এখন টেনে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে আসছে ফায়ারব্রিগেডের লোকেরা। আগুন এখনও জ্বলছে বটে, কিন্তু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কমে এসেছে। কোইভিসতু আর করনিচয়কে কোথাও দেখা গেল না, তবে পঁচিশ-ত্রিশ জন সৈনিককে গায়ে গা ঠেকিয়ে নির্দিষ্ট একটা জায়গার দিকে রাইফেল উঁচিয়ে এগোতে দেখল ও।

সময় নেই, একটু পরই প্রথম মিগের ওপর সবার মনোযোগ ফিরে আসবে। হয়তো এরই মধ্যে অনেক বেশি দেরি করে ফেলেছে ও। আগুন নিভে আসছে, নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রথম মিগকে হ্যাঙ্গার থেকে বের করার অজুহাত এখন অচল।

হ্যাঙ্গারের দেয়াল ঘেঁষে আচমকা বিশাল একটা আগুন লাফ দিয়ে উঠল। সেই সাথে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। অ্যাসবেসটস-এর স্যুট পরা একজন দমকল কর্মী ছিটকে সরে এল আগুনটার কাছ থেকে। একটা তেলের ড্রাম বিস্ফোরিত হয়েছে। পিপি টু নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছে, কিন্তু ছোট ট্রাক্টরটা আবার চালু হলো, আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে আসছে ওটাকে। রানা দেখল, এই ওর সুযোগ।

দরজার কাছ থেকে মিগ-৩১ ত্রিশ গজ দূরে। এগোল রানা।

সাতজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছে এয়ারকিং-কে। শিথিল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, দরজার দিকে পিছন ফিরে নতুন করে মাথাচাড়া দেয়া আগুনের শিখা দেখছে। পাইলটের মই এখনও জায়গামত রয়েছে, ওটায় দাঁড়িয়েই ফচের কাজ তদারক করে গেছে কোইভিসতু। ত্রিজ গজ পেরিয়ে এল রানা। মইয়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন সৈনিক, কনুই দিয়ে তার পাঁজরে গুঁতো মারল রানা। 'ডিউটির সময় সিধে হয়ে দাঁড়াতে হয়, সোলজার,' মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল ও।

সিধে হলো সৈনিক, লে. কর্নেল বেনিন মনে করে ঠকাস করে স্যালুট ঠুকল। দেখাদেখি বাকি ছয়জনও। মই বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। পিছন ফিরে নিচে তাকাল না ও, তাকালে দেখতে পেত স্যালুট করলেও, চোখে সংশয় আর দ্বিধা নিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে সাতজন।

ককপিটে মাথা গলিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে রানা, নিচ থেকে একজন সৈনিক সাহস করে জিজ্ঞেস করল, 'কর্নেল বেনিন?'

ককপিট থেকে মাথা বের করল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে নিচে তাকাল। তরুণ একজন সৈনিক, ঘামে ভিজে আছে মুখ, চোখ দুটো টকটকে লাল। ইউনিফর্ম দেখে রানা বুঝল, কে.জি.বি-র একজন জুনিয়র অফিসার। অটোমেটিক ধরা হাতটা শরীরের পাশে ঝুলছে। মই বেয়ে দু'ধাপ ওপরে উঠে এসেছে সে।

'বলো?'

'কি করছেন আপনি, কর্নেল?'

ওরা সাতজনই মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'তোমার মুণ্ডু করছি।' ভাইজারের ভেতর থেকে ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল রানার গলা। 'ওটার মত এটারও ক্ষতি হোক তাই চাও নাকি? দেখতে পাচ্ছ না কি করছি?'

ধমকে তেমন কাজ হলো না। রানার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল তরুণ জুনিয়র অফিসার, 'জ্বী?'

'গর্দভ! দেখতে পাচ্ছ না, ককপিটে উঠছি? এটাকে আমি হ্যাঙ্গারের বাইরে নিয়ে যাব।' আবার ককপিটের ভেতর মাথা গলিয়ে দিল রানা। ভেতরে ঢুকে বসে পড়ল পাইলটের সীটে। হাত দিয়ে প্যারাস্যুটের স্ট্র্যাপ খুঁজছে, এই ফাঁকে একটু ঝুঁকে নিচে তাকাল ও।

মই থেকে নেমে বেশ কয়েক পা পিছিয়ে গেছে তরুণ সৈনিক,

বাকি ছয়জনও রয়েছে তার সাথে। মুখ তুলে ককপিটের দিকে তাকিয়ে আছে সাতজন। পাইলটকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। হেলমেটের টিন্টেড ফেস-মাস্ক, তার সাথে রয়েছে অক্সিজেন-মাস্ক, পাইলটের সীটে বসা লোকটা কর্নেল বেনিন কিনা বলা অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে কি করণীয়, ওরা ঠাহর করতে পারছে না। তরুণ সৈনিক দ্রুত নিজের চারদিকে তাকাল একবার। সিনিয়র কোন অফিসারকে দরকার এখন। কিন্তু তেমন কাউকে দেখল না। চাপা স্বরে কি যেন বলল সে। দু'জন এদিক ওদিক মাথা নাড়ল, একজন ওপর-নিচে। বাকি চারজন স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। দ্বিতীয় মিগ-কে টেনে হ্যাঙ্গারের দরজার দিকে অনেকটা সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, এটা তো ওরা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে। আগুন যদিও প্রায় নিভে এসেছিল, কিন্তু আরও একটা তেলের ড্রাম বিস্ফোরিত হওয়ায় আবার নতুন করে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জুনিয়র অফিসার ভাবছে, মেজর বাস্কি আর মেজর রাভিক তাকে কড়া নির্দেশ দিয়ে বলে গেছেন, কর্নেল সাসকিনের সরাসরি অর্ডার ছাড়া প্লেনের কাছে কাউকে যেন ঘেঁষতে দেয়া না হয়। কিন্তু সে নির্দেশ কি পাইলটের জন্যেও প্রযোজ্য?

ওদের দিকে একটা চোখ রেখে যত দ্রুত সম্ভব প্রি-স্টার্ট চেক শুরু করল রানা। রেডিও আর কম্যুনিকেশন ইকুইপমেন্টের প্লাগ লাগাল। না তাকিয়েই খুঁজে পেল সকেটগুলো, যেন এই প্লেন আগেও অনেকবার চালিয়েছে ও। কোইভিসতুর পাঠানো বর্ণনা, ফটোগ্রাফ আর কমপিউটর প্রজেকশনের সাহায্যে এয়ারকিঙের যে ডামিটা ল্যাংলি, ভার্জিনিয়াতে তৈরি করা হয়েছিল,

রানাকে ট্রেনিং দেয়ার কাজে সেটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। ডামি আর ট্রেনিং এর উপকার এখন টের পাওয়া গেল। এরপর হেলমেট আর উইপনস্ সিস্টেমের মধ্যে সংযোগ দিল ও। ছোট্ট

একটা জ্যাক প্লাগ, রেডিওতে যেমন থাকে। জ্যাক প্লাগটা ইজেকটর সীটের পাশে ঢুকিয়ে দিল শুধু। উইপনস সিস্টেমের অনুপম একটা আবিষ্কার এটা, কোন কারণে পাইলটকে যদি ইজেক্ট করতে হয়, সিস্টেমের মেকানিজম তারপরও ব্যবহার করতে পারবে ও। শুধু তাই নয়, উইপনস সিস্টেমে, প্লেনের কোন অংশ বা অস্ত্র-শস্ত্র শত্রুর হাতে যাতে না পড়ে তার ব্যবস্থাও করতে পারবে।

গজগুলোর রিডিং নেয়ার আগে দ্রুত একবার প্লেনের বাইরে তাকাল রানা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এখনও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে জুনিয়র অফিসার। দু'জন সৈনিক কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে তাকে। চেহারায় দ্বিধা আর উদ্বেগের ভাব নিয়ে তাদের কথা শুনছে সে। অক্সিজেন সাপ্লাই ইউনিটে প্লাগ লাগাল রানা, কানেকশনের আরেকটা তার জুড়ে দিল ইমার্জেন্সী অক্সিজেনের সাথে। এরপর অ্যান্টিজি ডিভাইস-এর সুইচ অন করল—একটা লিড প্রেশার স্যুটের গায়ে বসানো সকেটে ঢুকে গেল, ঠিক রানার বাঁ হাঁটুর নিচেই। পাইলটের রক্তে দ্রুত বেড়ে ওঠা জি-ফোর্সের হুমকি প্রতিহত করার জন্যে স্যুটের ভেতর বাতাস সরবরাহ করবে এটা। অকস্মাৎ বাঁক নেয়ার সময়, ডাইভ দেয়ার সময় বা গতি দ্রুত হওয়ার সময় পাইলটের রক্তে জি-ফোর্স তৈরি হয়। অত্যন্ত সাবধানে সিস্টেমটা পরীক্ষা করল রানা। প্রেশার স্যুটের ভিতর বাতাস অনুভব করল ও। শরীরের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে গজের ওপর চোখ রাখল। চমৎকার কাজ করছে।

প্রি-ফ্লাইট রুটিন-এ অ থেকে ত পর্যন্ত পরীক্ষা করে নিচ্ছে রানা, অথচ জানে অপব্যয় করার মত হাতে একটা সেকেন্ডও নেই। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল বাকি গজগুলো; ফ্ল্যাপ, ব্রেক, ফুয়েল। ফুয়েল ট্যাংক পুরোমাত্রায় ভর্তি, তার দরকারও আছে, কারণ রিফুয়েলিং পয়েন্ট কি ধরনের বা ঠিক কি পজিশনে আছে

ওর কোন ধারণা নেই।

আরেকটা কাজ বাকি আছে। স্যুটের শোল্ডার-পকেট থেকে ব্লিপার অর্থাৎ রিসিভারটা বের করল। লন্ডন থেকে মস্কোয় আসার সময় ছোট্ট একটা ট্র্যান্‌জিসটর রেডিও সাথে করে নিয়ে এসেছিল ও, তার ভেতরই ছিল এই রিসিভার। খুদে একটা কালো জিনিস, চ্যাপ্টা সার্কিট-বোর্ডের মত দেখতে, আসলে এটা রেডিওর পিছনের ঢাকনি। সি.আই.এ-র তরফ থেকে পিটি ডাভকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সেটা পালন করল রানা—ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের এক কোণে টেপ দিয়ে রিসিভারটা আটকে দিল। মনে মনে প্রার্থনা করল ও, গত তিন দিনে কম ঝাঁকি খায়নি জিনিসটা, দরকারের সময় যেন ঠিকমত কাজ করে।

রানা এখন তৈরি। রুটিন চেক শেষ করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়েছে ও। ছোট ট্রাক্টরটা এখনও টেনে আনছে দ্বিতীয় মিগ-কে। ককপিটের দরজা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখল সাতজনের মধ্যে ছয়জনই নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে, কিন্তু তরুণ জুনিয়র চেহারায় রাজ্যের দ্বিধা আর উদ্বেগ নিয়ে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। দরজা দিয়ে বাইরে ঝুঁকল রানা, হাত নেড়ে সরে যেতে বলল তাকে। 'ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মারা পড়বে,' বলে নিজের গলার একদিক থেকে আরেক দিকে একটা আঙুল বুলাল রানা, তারপর ইঙ্গিতে প্লেনের উইং আর ইঞ্জিন-ইনটেক দেখাল। নিজের পিছনে তাকাল জুনিয়র, বুঝল, কিন্তু নড়ল না। তিন সেকেন্ড পর আত্মরক্ষার তাগিদ অনুভব করল সে। মইটা তুলে নিয়ে পিছিয়ে গেল এবার।

ভাইজারের ভেতর হাসল রানা। সীটের ওপর নড়েচড়ে বসার সময় উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে হ্যাঙ্গারের দরজার দিকে চোখ বুলাল একবার। ওই দরজা দিয়ে খুব বেশি হলে এক মিনিট আগে ঢুকেছে ও। কর্নেল সাসকিনকে দেখল ও, কাগজের মত সাদা,

নিশ্প্রভ মুখের চেহারা। একটা হাত লম্বা করে দিয়েছে সে, সরাসরি প্লেনের ককপিটের দিকে তাক করা। তার পিছনে ভিড় করে রয়েছে আরও কয়েকজন লোক। তাদের মধ্যে মাত্র একজনকে চিনতে পারল রানা। ক'মিনিট আগে পাইলটদের রেস্ট-রূমে এই লোকের সাথেই কথা বলে এসেছে ও। ক্যাপ্টেন।

লে. কর্নেল বেনিনের অচেতন দেহ আবিষ্কার করে ফেলেছে ওরা। জানে, ককপিটে বসা লোকটা নকল, বিদেশী এজেন্ট।

সাসকিনকে দেখেই বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে, নিজের অজান্তেই হুড কন্ট্রোলে হাত চলে গেল। একটা ক্লিক শব্দ করে নেমে এল হুড, ইলেকট্রনিক্যাল লক হয়ে গেল। তারপরও ম্যানুয়্যাল লক করল ও, সাবধানের মার নেই। মেশিনের সাথে এক হয়ে গেল রানা। প্লেনেরই একটা অংশ এখন ও।

কোন উত্তেজনা নয়, নয় কোন ভীতি, শুধু দায়িত্ববোধ ছাড়া এই মুহূর্তে কিছুই অনুভব করছে না রানা। মিগ-৩১-এর ককপিটে উঠতে পেরেছে, রুটিন চেক শেষ করেছে, তবু কোন উল্লাস বোধ করল না। মস্কোয় ঢোকার পর থেকে এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে আর আগামী কয়েক ঘণ্টায় যা ঘটবে দুটোর সাথে তুলনা করতে হলে বলতে হয়, এবার সত্যিকার বিপদে পড়তে যাচ্ছে রানা। লুকোচুরি খেলা শেষ। এবার ঠেকাতে হবে আক্রমণ।

গোটা সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৎপর হয়ে উঠবে ওর বিরুদ্ধে।

ককপিট এয়ার-প্রেশার চেক করল রানা। সামনে ঝুঁকে ইগনিশন সুইচগুলো গ্যাং-লোড করল, স্টার্টার-মটরের বোতাম টিপল, হাইপ্রেশার কক ঘোরাল, সবশেষে এক ঝটকায় চাপ দিল স্টার্টার বাটনে।

ককপিট থেকে ফিউজিলাজের মাঝখানে কোথাও একজোড়া বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। কাজ শুরু করল কার্ট্রিজ। কালচে

ধোঁয়ার এক জোড়া কুণ্ডলী পাক খেয়ে বেরিয়ে এল ইঞ্জিন থেকে। টারবাইন ঘোরার আওয়াজ দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো। জাইরো ইন্সট্রুমেন্ট চেক করল রানা। ফ্ল্যাশিং লাইট চোখে পড়ল, অর্থাৎ ফুয়েল-বুস্টার পাম্পের কথা ভুলে গেছে ও। বোতাম টিপতেই প্যানেল থেকে অদৃশ্য হলো আলোটা। সন্তর্পণে থ্রটল খুলল ও, চোখ রয়েছে আর-পি-এম গজের ওপর–টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট পর্যন্ত উঠে এল কাঁটা। সাইড-উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল ও। কর্নেল সাসকিন আর তার দুই সঙ্গী যেন স্টার্টার-কার্ট্রিজের বিস্ফোরণে প্রাণ ফিরে পেয়েছে, লম্বা লম্বা পা ফেলে প্লেনের দিকে ছুটে আসছে তারা। কিন্তু রানার দ্রুত গতি অ্যাকশন আর মেশিনের সাড়া দেয়ার তুলনায় মনে হলো ওরা যেন পানির তলায় নড়াচড়া করছে–এতই মন্থর গতিতে, যে এখন আর রানাকে বাধা দেয়া সম্ভব নয়। একটা রিভলভার বা পিস্তল দেখল রানা, সরাসরি ককপিটের দিকে তাক করা।

ককপিটের ওপর দিয়ে হিস্‌স্‌ করে বেরিয়ে গেল বুলেট।

জে-পি-টি-(জেট-পাইপ টেমপারেচার) গজের ওপর একটা চোখ রেখে, আবার একটু একটু করে থ্রটল খুলতে শুরু করল রানা, যতক্ষণ না আর-পি-এম গজের কাঁটা ফিফটি ফাইভ পার্সেন্টে পৌঁছুল।

এবার ব্রেক রিলিজ করে দিল রানা।

এতক্ষণ মিগ-৩১-কে আটকে রেখেছিল ব্রেকগুলো, ছাড়া পেয়ে ঠিক গড়াতে শুরু না করে অনেকটা যেন পিছলে সামনের দিকে ছুটল। সামনে হ্যাঙ্গারের বিশাল দরজা, বাইরের আকাশে দিনের প্রথম আলো ফুটব ফুটব করছে। অনেক লোক, গুনে শেষ করা যায় না, প্রাণপণে দরজার দিকে ছুটছে–উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধে হয় না, দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঠেকাতে চায় রানাকে। কিন্তু রানার চোখে ওরাও যেন পানির তলায় নড়াচড়া

করছে—অনেক দেরি করে ফেলেছে ওরা, এয়ারকিঙের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে।

আবার একবার গজগুলো আর বুস্টার পাম্প চেক করল রানা। হ্যাঙ্গারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল মিগ-৩১। মিররে চোখ রেখে ও দেখল, হ্যাঙ্গারের ভেতর থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে ইউনিফর্ম পরা সৈনিকরা। দু'একজনকে সটান পড়ে যেতেও দেখল ও, বোধহয় প্রিয় বস্তু হারাবার শোকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কেউ কেউ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাতের তালু দিয়ে কপাল চাপড়াল। দীর্ঘদেহী একজনের ওপর চোখ পড়ল রানার। মাথার চুল ছিঁড়ছে। ঠিক চেনা গেল না, মনে হলো কর্নেল সাসকিনের সাথে লোকটার চেহারার মিল আছে।

ট্যাক্সিওয়ে থেকে রানওয়ের দিকে ছুটে চলেছে মিগ-৩১।

রাডার আর ডিফারেনশিয়াল ব্রেকিং ব্যবহার করে বাঁক নিল রানা, মিগ-৩১ উঠে এল রানওয়েতে। প্লেনটাকে সিধে করার সময় আরও একবার সব কিছু চেক করে দেখে নিল ও। খুব জোরে, বড় করে একটা শ্বাস টানল, তারপর পুরোপুরি খুলে দিল থ্রটল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো রানা, সেই সাথে এই প্রথম অদ্ভুত এক উল্লাসে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সারা শরীর। বেপরোয়া গতিতে ছুটে চলল মিগ-৩১।

একশো পঁয়ষট্টি নট, এলিভেটর-কন্ট্রোল চালু করে দিল রানা। এয়ারকিং রানওয়ে ত্যাগ করল। রানওয়ের সাথে সম্পর্ক বিছিন্ন হতে প্লেনের গতি আরও একটু বাড়ল। আন্ডার-ক্যারিজ তুলে নিল রানা।

এই পাওয়ার কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে ওর পরিচয় নেই, অনভ্যস্ত হাতে প্লেনটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে মাত্রা ঠিক রাখতে পারল না, ফলে ঘন ঘন একবার এদিক একবার ওদিক কাত হয়ে পড়ল ডানাগুলো। প্রায় খাড়াভাবে ওপরে আকাশের দিকে উঠে

যাচ্ছে প্লেন।

উদীয়মান সূর্যের আলোয় ঝিক্ করে উঠল কি যেন, নাকের একটু ডান দিক ঘেঁষে। স্টিক টানল রানা, ডান দিকে ঠেলে দিল। প্লেন বাঁক নিতে শুরু করতেই অ্যান্টি-জি প্রেশার অনুভব করল ও, ওভার-কন্ট্রোলের ফলে আধপাক ঘুরে গেল এয়ারকিং, একটা ডানা মাটির দিকে তাক করা। দ্রুত হাত চালিয়ে ডানাদুটোকে সোজা করল ও। বাঁ দিকে, নিচে আর পিছনে তাকাল। একটা টুপোলেভ টি-ইউ-ওয়ান-ফোর বিলিয়ারস্ক এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করার জন্যে ছুটে আসছে। ও জানে ও সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি, কে.জি.বি. চীফ, এয়ার মার্শাল, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীসহ হোমড়াচোমড়া প্রশাসনিক কর্মকর্তারা রয়েছেন ওই প্লেনে। অলটিমিটারের দিকে তাকাল রানা। এরই মধ্যে আট হাজার ফিট ওপরে উঠে এসেছে ও।

আন্ডারক্যারিজ রানওয়ে ত্যাগ করার পর আঠারো সেকেন্ড পেরিয়েছে। যে-কোন সোভিয়েত সীমান্ত থেকে এক হাজার মাইল দূরে রয়েছে ও। রানা জানে, এই হাজার মাইল পাড়ি দিতে ওর জীবনের সবচেয়ে বিপদ সংকুল সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে হবে ওকে।

ঠিক ভয় পেল না, তবে বুকটা একবার কেঁপে উঠল। মনে পড়ল দেশের কথা, মনে পড়ল বন্ধু-বান্ধবদের কথা। একটা চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। অত্যন্ত শক্তিশালী ওয়্যারলেস সেট সামনে নিয়ে ধ্যান-মগ্ন ঋষির মত বসে রয়েছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। রানা কোথায়, কি করছে জানার জন্যে আকুল হয়ে আছে তাঁর মন।

আরেকজনের চেহারা দেখতে পেল রানা। নুমার ডিরেক্টর, মার্কিন প্রেসিডেন্টের বন্ধু, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। রানাকে

তিনি কথা দিয়ে রেখেছেন, যেভাবেই হোক সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে সশরীরে উপস্থিত থাকবেন তিনি। পিটি ডাভ ওরফে রানা সম্পর্কে সি.আই.এ. যা জানতে পারবে, তিনি সে সব শোনার সাথে সাথে মিনি ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে জানিয়ে দেবেন বন্ধু মেজর জেনারেল রাহাত খানকে।

আর কিছু না হোক, আপনমনে হাসল রানা, ও মারা গেলে প্রায় সাথে সাথেই খবরটা পেয়ে যাবে বুড়ো। দুঃখ এই যে ওর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বুড়ো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে কিনা সেটা দেখার কোন সুযোগ হবে না।

সমস্ত চিন্তা আর কল্পনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল রানা। ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে একটা আত্ম প্রত্যয় বোধ। পেরেছে ও। মিগ-৩১ চুরি করতে পেরেছে।

এখন বাড়ি ফেরার পালা।

দুই

ব্যর্থতার গ্লানিতে নত হয়ে আছে মাথা, প্যাসেঞ্জার গ্যাংওয়ে ধরে টুপোলেভ টি-ইউ ওয়ান-ফোর ফোর-এ উঠে এল কর্নেল সাসকিন।

টুপোলেভ টি-ইউ ওয়ান ফোর-ফোর ফার্স্ট সেক্রেটারির ব্যক্তিগত বাহন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত প্লেন এয়ারফোর্স ওয়ান-এর সাথে এটার কোন অমিল নেই, দুটো প্লেন থেকেই দু'দেশের কর্ণধার যে-কোন জরুরী পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। যে-যার প্লেন থেকে পৃথিবীর যে-কোন দেশের সাথে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন তাঁরা, মন্ত্রী

বা সমর নায়কদের সাথে কথা বলতে পারেন, সরাসরি যোগাযোগ রাখতে পারেন ফাইটার স্টেশন আর মিসাইল ঘাঁটিগুলোর সাথে। দুটো প্লেনেই পুরোদস্তুর ওঅরকমান্ড অফিস রয়েছে।

সরাসরি সেখানেই ঢুকল সাসকিন।

ইতোমধ্যে ফ্লাইট-ডেকের আল্ট্রা-হাই-ফ্রিকোয়েন্সী-র মাধ্যমে মিগ-৩১ চুরির খবর পেয়ে গেছেন ফার্স্ট সেক্রেটারি আর তাঁর সফর সঙ্গীরা। এয়ারক্রাফটের মিলিটারি কমান্ড সেকশনে ঢুকে সাসকিন দেখল, সোভিয়েত রাশিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী চার কর্মকর্তা ডিম আকৃতির কমান্ড টেবিলে বসে আছেন। ফার্স্ট সেক্রেটারি, কে.জি.বি. চীফ উলরিখ বিয়েগলেভ, এয়ার মার্শাল মিখাইল ঝনঝেনিৎসিন আর যুদ্ধ-মন্ত্রী ফিউদর বাকুনিন। ফার্স্ট সেক্রেটারি বসেছেন টেবিলের মাথায়, গোড়ার দিকে বসেছেন যুদ্ধ-মন্ত্রী, টেবিলের বাকি দু'ধারের সামনাসামনি বসেছেন কে.জি.বি. চীফ আর এয়ার মার্শাল।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যালুট ঠুকল সাসকিন, চোখের দৃষ্টি নাক বরাবর সোজা স্থির করে রাখল। চুরুট আকৃতির কামরার শেষ প্রান্তে একজন রেডিও অপারেটরের মাথার পিছনটা দেখা যাচ্ছে। সাসকিন উপলব্ধি করল, চারজন মহারথীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিদ্ধ করছে তাকে। সে জানে, কমান্ড টেবিলে প্রজেকশন ইকুইপমেন্ট আছে, বোতাম টিপলেই টেবিলে ফুটে উঠবে রাশিয়া বা পৃথিবীর যে কোন অংশের ম্যাপ।

কে.জি.বি-র ব্যর্থতা মানে চীফ বিয়েগলেভের মাথা কাটা গেছে। প্রকাণ্ড লালচে মুখ থমথম করছে তার, বুনো আর একগুঁয়ে ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে আছেন, কিন্তু চোখের পাপড়ি আর ভুরুর ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছেন কর্নেলের দিকে। হাবভাব দেখে মনে হয় পারলে কাঁচা চিবিয়ে খেতেন সাসকিনকে।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। সাসকিন এখনও আড়ষ্ট

ভঙ্গিতে স্যালুট দিয়ে রয়েছে, তাকে স্বাভাবিক হতে বা বসতে বলা হয়নি। চোখের কোণ দিয়ে সে দেখল, ফার্স্ট সেক্রেটারি মুখ তুললেন, তাঁর সোনালি ফ্রেমের চশমা ঝাড়-বাতির আলো লেগে ঝিক্ করে উঠল।

'কর্নেল সাসকিন, আপনি আমাদের ব্যাখ্যা করে বলবেন ঠিক কি ঘটেছে?' প্রশ্ন করলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু কর্তৃত্বের সুর পরিষ্কার কানে বাজল। দেখে মনে হলো তিনি উদ্বিগ্ন নন, ব্যস্ত তো ননই। রেডিও থেকে ক্ষীণ হিস্‌স্ শব্দ আসছে, তাছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। রানা মিগ-৩১ নিয়ে চলে যাবার পর প্রায় তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে, অথচ এখনও কিছু করা হয়েছে বলে মনে হলো না।

একটা ঢোক গিলল সাসকিন। সে ধরে নিয়েছিল তার বস্ তাকে জেরা করবে, ধমকাবে, গালি গালাজ করবে, আর সবশেষে হয়তো প্লেনের ভেতরই গুলি করে মেরে ফেলবে। আসলে এ-ধরনের পরিস্থিতিতে ঠিক কি হয়, তার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ফার্স্ট সেক্রেটারির শান্ত ব্যবহার লক্ষ করে অস্বস্তি আর উদ্বেগ বোধ করল সে। আস্তে করে কেশে গলা পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষম খেল, কেশে উঠল সশব্দে।

ওঁরা সবাই ওকে নিঃশব্দে লক্ষ করছেন।

'একজন ইসরায়েলি ইহুদি...' শুরু করল সাসকিন, আবার কেশে উঠল। আগের মতই নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে আছে সে, তার দৃষ্টি জুড়ে শুধু রেডিও অপারেটরের মাথা। 'একজন ইসরায়েলি পাইলট, নাম পিটি ডাভ, মিগ-৩১ চুরি করে নিয়ে গেছে, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি।'

'অনেক আগেই তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলাম, ইসরায়েল মিগ-৩১ হাইজ্যাক করার প্ল্যান করছে,' বোমার মত বিস্ফোরিত হলো কে.জি.বি. চীফ বিয়েগলেভের ভারী

গলার প্রতিটি শব্দ। 'তারপরও একজন পাইলট পাঠিয়ে মিগ-৩১ নিয়ে যেতে পারল ওরা? তুমি তাহলে কি করছিলে?'

সাসকিনের বলতে ইচ্ছে করল, ইসরায়েলিরা মিগ-৩১ হাইজ্যাক করার প্ল্যান করছে এ-কথা আপনি আমাকে জানাননি। আপনি বলেছিলেন, একটা গুজব ছড়িয়েছে, সি.আই.এ. নাকি মিগ-৩১ স্যাবোটাজ করার জন্যে লোক পাঠাবে। বলেছিলেন, সে গুজবে কান দেয়ার কোন দরকার নেই। কিন্তু এ-সব কথা বলার চেয়ে বিষ খাওয়া ঢের সহজ। কাজেই চুপ করে থাকল সাসকিন।

ফার্স্ট সেক্রেটারি জানতে চাইলেন, 'কিভাবে চুরি করল?'

'মিকোয়ান প্রজেক্টে কয়েকজন ইহুদি কাজ করছিল, তাদের সহায়তায় লোকটা ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারা এখন কেউ বেঁচে নেই।'

'তাদের কাছ থেকে কিছু জানতে পেরেছেন?'

ফার্স্ট সেক্রেটারির চওড়া, বার্ধক্যের ভাঁজ ফুটে থাকা মুখের দিকে একবার তাকাল সাসকিন। তার ধারণার সাথে মিলে গেল—চোখ নয় যেন চকচকে খয়েরী দু'টুকরো পাথর। 'আমরা...আমরা কিছুই জানতে পারিনি।' কোন রকমে বলতে পারল সে।

কমান্ড অফিসে নিস্তব্ধতা নেমে এল। সাসকিন দেখল, শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে রেডিও-অপারেটরের, শরীরের পেশী টান টান। আবার ডিম্বাকৃতি টেবিলের দিকে তাকাল সে। ফার্স্ট সেক্রেটারির লোমহীন, শিরা ফুটে থাকা হাতটা টেবিলের ওপর স্থির পড়ে আছে। এয়ার মার্শাল ঝনঝেনিৎসিন আঙুলের গিঁট দিয়ে ঠকঠক মৃদু টোকা দিচ্ছেন টেবিলে। বিশাল ভাল্লুকের মত চেহারা ভদ্রলোকের, শুধু গায়ের রঙটা সাদা। ষাট বছর বয়সেও তাঁর ওজন তিন মনের কাছাকাছি, লম্বায় ছ'ফিট, গোটা মাথা পিতলের মত চকচক করছে। মিগ-৩১ চুরি হওয়ায় তাঁরই

সবার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে, অথচ তাঁকে তেমন উত্তেজিত বা অস্থির দেখাল না। মনে হলো একমনে দ্রুত কি যেন হিসেব কষছেন তিনি। মুখ তুলে একবার ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে তাকালেন, যেন বলতে চাইলেন ঝামেলা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারলে ভাল হয়, কাজে হাত দিতে হবে।

'আপনি তাহলে জানেন না, মিগ-৩১ কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে?' আবার জানতে চাইলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি।

'অকর্মা, অলস, উজবুক!' আবার বিস্ফোরিত হলেন কে.জি.বি. চীফ বিয়েগলেভ। 'তোমাকে আমি...'

কে.জি.বি. প্রধান বিয়েগলেভের হাতে মৃদু একটা চাপড় দিলেন এয়ার মার্শাল ঝনঝেনিৎসিন, তাকে শান্ত থাকার অনুরোধ করলেন। তারপর নিজেই প্রশ্ন করলেন, 'কিছুই তাহলে জানেন না আপনি?' পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে আছেন তিনি, প্রায় সবটুকু ইউনিফর্ম ঢাকা পড়ে আছে উজ্জ্বল ইনসিগনিয়া, পদক, ফিতে, ব্যাজ আর কর্ডে। তাঁকে আহত এবং বিস্মিত দেখাল।

'না,' অস্ফুটে বলল সাসকিন, আর সবাই কোন রকমে শুনতে পেলেও তার নিজের কানে আওয়াজটা বিস্ফোরণের মত শোনাল।

'তাহলে আর আপনাকে আমাদের দরকার নেই,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। এরপর কয়েক মুহূর্তের অখণ্ড নীরবতা। এই সময়টুকুতে নিজের পরিণতি উপলব্ধি করতে পারল সাসকিন। ফার্স্ট সেক্রেটারি থেকে শুরু করে রাশিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তা আর যাঁরা রয়েছেন এখানে, তাঁদের কাছে ওর আর কোন অস্তিত্ব নেই।

'কর্নেল সাসকিন, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেকে আপনি গার্ডদের হাতে তুলে দেবেন,' যার যেমন অভ্যেস, কে.জি.বি. চীফ বিয়েগলেভের প্রতিটি শব্দ বিস্ফোরণের মত শোনাল। 'বেরিয়ে যান!'

এর বেশি একজন মানুষকে আর কিভাবে অপমান করা যেতে পারে। সাসকিনের মনে হলো, ধরণী দ্বিখণ্ডিত হলে সে মুখ লুকাতে পারত।

কামরা থেকে সাসকিন বেরিয়ে গেল, তার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। মুখ ফিরিয়ে সরাসরি কে.জি.বি. চীফের দিকে তাকালেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। বললেন, 'এই ব্যর্থতার দায় আপনিও কিন্তু এড়িয়ে যেতে পারেন না, কমরেড বিয়েগলেভ।'

ধীরে ধীরে নত হলো উলরিখ বিয়েগলেভের মাথা। 'সে চেষ্টা আমি করছিও না, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি,' ভারী গলায় বললেন কে.জি.বি. চীফ। 'আমার বিশ্বাস, বাইরে থেকে দেখে যাই মনে হোক, এই অপারেশনের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি জড়িত। এর মূল্য ওদেরকে দিতে হবে। এর বেশি এখন আর আমি কিছু বলতে চাই না।'

'কাউকে দোষারোপ করার সময় নয় এটা,' শান্ত সুরে বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'কে জড়িত আর কে নয় এই মুহূর্তে তারও কোন গুরুত্ব নেই। সময় যত বয়ে যাচ্ছে, আমাদের কাছ থেকে ততই দূরে সরে যাচ্ছে মিগ-৩১।' এয়ার মার্শালের দিকে তাকালেন তিনি। 'কোথায়, কোন্‌দিকে, এয়ার মার্শাল?'

ছোট একটা কনসোল নিয়ে একজন অপারেটর বসে আছে, সোভিয়েত এয়ারফোর্সের মার্শাল ঝনঝেনিৎসিন তার দিকে তাকালেন। 'চঞ্চল মৌমাছি, জলদি!'

চার মহারথী টেবিলের ওপর থেকে সিগারেট কেস, লাইটার ইত্যাদি যা ছিল সব সরিয়ে নিলেন। ওদিকে কনসোলের সামনে বসা অপারেটর এক ঝটকায় কয়েকটা বোতামে চাপ দিল। টেবিলের ওপর সোভিয়েত রাশিয়ার একটা প্রজেকশন ম্যাপ ফুটে উঠল, ম্যাপের গায়ে রঙ-বেরঙের অসংখ্য খুদে ফোঁটা। ওদের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়নের আউটার ডিফেন্স-এর বিশাল

ডায়াগ্রাম উন্মোচিত হয়েছে। সামনের দিকে ঝুঁকে ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে টোকা দিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'বিলিয়ারস্ক,' বললেন তিনি। 'এখন, কোন্‌দিকে গেছে সে?'

'আমরা জানি না, ফার্স্ট সেক্রেটারি,' প্রকাণ্ড শ্বেত ভাল্লুকের গলা থেকে গম্ভীর, গমগমে আওয়াজ বেরিয়ে এল। পিতলের মত চকচকে টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে ঝনঝেনিৎসিন ফিউদর বাকুনিনের দিকে তাকালেন। ঝনঝেনিৎসিন যদি শ্বেত ভাল্লুক হন, পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি লম্বা আর পৌনে তিনমণ ওজনের যুদ্ধমন্ত্রীকে শ্বেত হস্তী বলা চলে অনায়াসে। বাকুনিনকে রীতিমত হাসিখুশি দেখাল, এত বড় একটা ক্ষতি বা বিপদ তাঁকে যেন স্পর্শই করেনি। চট করে একবার উলরিখ বিয়েগলেভকে দেখে নিয়ে ঝনঝেনিৎসিনের উদ্দেশ্যে শুধু মাথা ঝাঁকালেন তিনি। ঝনঝেনিৎসিন তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারলেন। কে.জি.বি. চীফের ব্যর্থতা যুদ্ধমন্ত্রীকে উল্লসিত করে তুলেছে। ওদের দু'জনের সম্পর্ক এক কথায় সাপে নেউলে। যুদ্ধমন্ত্রী এ-ও জানেন, এই পরিস্থিতিতে মিগ-৩১ কেউ যদি উদ্ধার করতে পারে তো সে এয়ার মার্শাল ঝনঝেনিৎসিন। মাথা ঝাঁকাবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, তাঁকে উৎসাহ দেয়া।

'কিভাবে জানা যায়?' জিজ্ঞেস করলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি।

সোভিয়েত এয়ারফোর্সের ট্যাকটিক্যাল স্ট্রাইক আর্ম-এর সাঙ্কেতিক নাম চঞ্চল মৌমাছি। চঞ্চল মৌমাছির কমান্ড্যান্ট হলেন এয়ার ভাইস মার্শাল দারোভস্কি, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে মার্শাল ঝনঝেনিৎসিনকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সরাসরি ফার্স্ট সেক্রেটারির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, 'দু'জায়গায় একটা করে স্ট্যাগারড্‌ সেক্টর স্ক্র্যাম্বল করব আমরা। দক্ষিণ আর উত্তর সীমান্ত বরাবর যত বেশি সম্ভব প্লেন পাঠাতে হবে।'

'উত্তর আর দক্ষিণে...কেন?'

‘কারণ, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি,’ ম্যাপের ওপর চোখ রেখে ঝনঝেনিৎসিন বললেন, ‘এই পাগলকে নিরাপদ কোথাও পৌঁছুতে হলে অবশ্যই আবার ফুয়েল নিতে হবে। আকাশে থাকা অবস্থায় তা সম্ভব নয়—তার জন্যে কোথাও কোন প্লেন যদি অপেক্ষায় থাকে, তা সে নিরপেক্ষ বা শত্রু আকাশের যেখানেই হোক না কেন, আমরা তা জানতে পারব।’

‘আমাদের এই প্লেনের রেঞ্জ কত?’ টেবিলের তলা থেকে রিসিভার বের করে লিওনিদ তেরোভের সাথে ফোনে কথা বলছেন যুদ্ধমন্ত্রী। তেরোভ সোভিয়েত এয়ারফোর্সের ই-সি-এম (ইলেকট্রনিক কাউন্টার-মেজারস) সেকশনের কমান্ড্যান্ট। পশ্চিম ইউরোপ বা আমেরিকার সাথে যুদ্ধ বেধে গেলে এয়ার ভাইস মার্শাল তেরোভই রাডার আর মিসাইল ডিফেন্সের সাথে এয়ার ডিফেন্সের সমন্বয় সাধন করবেন।

‘পুরোমাত্রায় ফুয়েল ভরা থাকলে,’ ঝনঝেনিৎসিন বললেন, ‘প্রায় তিন হাজার মাইল পর্যন্ত রেঞ্জ। অবশ্য এই উন্মাদ মিগ-৩১ সম্পর্কে কতটুকু কি জানে, কিভাবে সেটাকে হ্যান্ডেল করবে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।’ আবার ম্যাপের দিকে তাকালেন তিনি। ‘তারমানে হয় এখানে, নয়তো এই এখানে যেতে পারবে সে।’ এয়ার মার্শালের হাত আর্কটিক ওশেন পর্যন্ত গেল, তারপর উল্টো দিকে চলে এল ইরান সীমান্ত আর ভূমধ্যসাগরের কাছে।

‘কিন্তু হয় উত্তরে না হয় দক্ষিণে কেন যাবে সে?’ জানতে চাইলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। মনে মনে তিনি নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। যুদ্ধ-সংক্রান্ত অনেক টেকনিক্যাল ব্যাপারে ভাল ধারণা নেই তাঁর।

‘কারণ, কোন পাইলটের পক্ষে মস্কো ডিফেন্সের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই ঝুঁকি কেউ নিলে মনে করতে হবে সে আত্মহত্যা করতে চায়। রাডার যে-প্লেনকে দেখতে পায় না,

সেটাকেও চোখের পলকে ফেলে দেবে মস্কো ডিফেন্স।'

কমান্ড অফিসে জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল। টেবিলে এঁরা চারজন গম্ভীর হলেন। দূরে যারা রয়েছে–রেডিও অপারেটর, সাইফারম্যান, গার্ড, সেক্রেটারি–সবাই স্থির হয়ে গেল। এয়ার মার্শাল আসল সত্যটা মুখ ফুটে বলে ফেলেছেন। মিগ-৩১ রাডারে ধরা পড়ে না। এই বিস্ময়কর সুবিধেটা এখন ভোগ করবে একজন বিদেশী পাইলট!

'ওটার অ্যান্টি-রাডার সিস্টেম...কি বলব,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন ঝনঝেনিৎসিন, '...বড় বেশি নিখুঁত, জাদুকেও হার মানায়।'

'ইসরায়েলি বা আমেরিকানরা অ্যান্টি-রাডার সম্পর্কে জানে, কমরেড বিয়েগলেভ?' মুখ তুলে কে.জি.বি. চীফের দিকে তাকালেন ফার্স্ট সেক্রেটারি।

চোখে হাসি নিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করলেন বাকুনিন আর ঝনঝেনিৎসিন।

বিয়েগলেভ কার সাথে যেন ফোনে কথা বলছিলেন। ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন। এ থেকেই উত্তরটা বুঝে নিতে হবে।

'শুধু অ্যান্টি-রাডার নয়, সবই জানে ওরা,' বললেন ঝনঝেনিৎসিন। 'মাফ করবেন, কমরেড বিয়েগলেভ, একটা কথা না বলে পারছি না। আপনার কে.জি.বি-তে শুধু ফুটো আর ফুটো। তা না হলে একজন পাইলট এতদূর পর্যন্ত আসতে পারত না।'

ফার্স্ট সেক্রেটারি এই প্রথম গম্ভীর, ভারী গলায় বললেন, 'এখন কোন অভিযোগ নয়। আমি অ্যাকশন চাই। কতটা সময় পাচ্ছি আমরা, এয়ার মার্শাল?'

হাতঘড়ি দেখলেন ঝনঝেনিৎসিন। ছ'টা বাইশ। মিগ-৩১

আকাশে উঠেছে সাত মিনিট হলো। 'যেদিকেই যাক, সোভিয়েত সীমান্ত পেরোতে হাজার মাইলের ওপর পাড়ি দিতে হবে তাকে, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি। বেশিরভাগ সময় সাব-সোনিক স্পীডে যেতে হবে তাকে, কারণ সে তার ফ্লাইট পাথে সুপারসোনিক ফুটপ্রিন্ট রাখতে চাইবে না। তাছাড়া ফুয়েলও বাঁচাতে চাইবে সে যদি সরাসরি ফ্লাই করে, তবু আমাদের হাতে এক ঘণ্টা সময় আছে।'

'এক ঘণ্টা? মাত্র এক ঘণ্টা?' ফার্স্ট সেক্রেটারি উপলব্ধি করলেন, এ-ধরনের টেকনিক্যাল ব্যাপারের সাথে তাঁর ভাল পরিচয় নেই। এয়ার মার্শাল এবং অন্যান্য সমরবিদরা যে টাইম-স্কেল-এর অধিকারী তাতে এক মিনিটেও হাজারটা কাজ শেষ করা সম্ভব। 'তা কি যথেষ্ট, এয়ার মার্শাল? আপনার কাজের জন্যে?'

প্রশ্নের উত্তর সরাসরি না দিয়ে ঝনঝেনিৎসিন বললেন, 'আগে যা বলেছি, ফার্স্ট সেক্রেটারি, চঞ্চল মৌমাছির একটা করে স্ট্যাগারড্ সেক্টর স্ক্র্যাম্বল করা হোক। চামড়ার চোখে ধরার জন্যে সেই সাথে শুরু করব ভিজুয়্যাল সার্চ। আকাশে আমরা এয়ারক্রাফটের একটা জাল পাতব, সেই জালে ধরা পড়তেই হবে তাকে। আমাদের চঞ্চল মৌমাছি আর শিকারী ঈগল স্কোয়াড্রন এই সিকোয়েন্স সম্পর্কে পরিষ্কার জানে। এর ভেতর কোথাও কোন ফুটো বা ফাঁক নেই।'

'ভেরি গুড!' খুশি আর তৃপ্ত দেখাল ফার্স্ট সেক্রেটারিকে।

'ঈগল স্কোয়াড্রনগুলো সীমান্ত থেকে তিনশো মাইল ভেতরে একটা ব্যারিকেড তৈরি করবে,' বললেন ঝনঝেনিৎসিন। 'আর মৌমাছি স্কোয়াড্রনগুলো একই সময়ে আকাশে উঠে সীমান্তের ওপর একটা পাঁচিল তুলে দেবে।'

'বেশ,' সন্তুষ্ট হলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, অনুমতি দিতেও দেরি করলেন না, 'আমি রাজি।'

কমান্ড সেন্টারের পরিবেশ থেকে উত্তেজনার ভাব একটু হালকা হলো।

'ধন্যবাদ, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি।' উঠে দাঁড়ালেন এয়ার মার্শাল, টেবিলের ওপর ঝুঁকে ম্যাপের টপোগ্রাফী ছাড়িয়ে যাওয়া রঙিন জোনগুলো পরীক্ষা করলেন। রঙিন ফোঁটাগুলো তাঁর স্কোয়াড্রন বেস, প্রতিটি স্কোয়াড্রন বেসের সাথে একটা করে মিসাইল ঘাঁটির সম্পর্ক আছে। সিধে হলেন তিনি, কিন্তু চোখ রয়েছে ম্যাপে, নাটকীয় ভঙ্গিতে নির্দেশ দিলেন, 'ঈগল স্ট্যাটাস ম্যাপ!'

রঙের ফোঁটা আরও বাড়ল, রুশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তর ভাগের ফাঁকা জায়গাগুলো নিয়মিত ব্যবধানে ভরে উঠল। তাঁর নির্দেশ গমগম করে উঠল, 'স্ক্র্যাম্বল, স্ক্র্যাম্বল! সার্চ-ব্রিফিং সহ, সিকোয়েন্স এস-এস-এস! লাল সেক্টর থেকে সাদা স্কোয়াড্রন, ব্রাউন সেক্টর থেকে সবুজ স্কোয়াড্রন!'

এক মুহূর্তের বিরতি।

'স্ক্র্যাম্বল, স্ক্র্যাম্বল! একই সাথে, ঈগল স্কোয়াড্রন। একই ব্রিফিং।' গাল চুলকাচ্ছেন ঝনঝেনিৎসিন, একমনে সাইফার মেশিনের খই ফোটা আওয়াজ শুনছেন। কমপিউটরে কোড হয়ে যাবে তাঁর নির্দেশ, তারপর ট্র্যান্সমিশন শুরু হবে। অপেক্ষা করছেন তিনি।

হাই স্পীড ট্র্যান্সমিশন শুরু হবার পর ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে ফিরলেন ঝনঝেনিৎসিন। 'মিগ-৩১ দেখতে পাবার পর কি করতে বলেন আপনি?'

এয়ার মার্শালের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'পাইলটের সাথে কথা বলতে চাই আমি,' শান্ত সুরে বললেন তিনি। 'সত্যি কথা বলতে কি, তাকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই।'

এয়ারকিঙে রয়েছে ইনার্শিয়াল নেভিগেটর, কন্ট্রোল প্যানেলে সেটার প্রতিনিধিত্ব করছে পকেট ক্যালকুলেটর আকৃতির একটা চাকতি। অনেকগুলো বোতাম রয়েছে তাতে, প্রত্যেকটির রয়েছে একটা করে শিরোনাম–যেমন, ট্র্যাক, হেডিং, গ্রাউন্ড স্পীড, কোঅর্ডিনেটস, ইত্যাদি। ওর জানা তথ্যগুলো ওতে ভরে দিতে পারে রানা, তাহলে অন-বোর্ড কমপিউটর বলে দিতে পারবে কোথায় যেতে কতক্ষণ লাগবে, কোত্থেকে কোথায় আসতে কতক্ষণ লেগেছে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব কত, ইত্যাদি। নির্দিষ্ট একটা সময় আর পজিশনে কমপিউটরে প্রোগ্রাম শুরু করলে ওটা হিসেব কষে বের করে দেবে কত স্পীডে ছুটছে প্লেন বা কোন্ দিকে ছুটছে। সেই সাথে দরকার হলে এয়ারক্রাফটের পরিবর্তিত পজিশনও জানতে পারবে।

উত্তর-পশ্চিম আকাশে, ভলগোগ্রাদের কাছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে রানার। মস্কো থেকে রওনা হয়ে একটা সিভিলিয়ান ফ্লাইট খুব সকালেই ওই আকাশ পথ দিয়ে যাবে। ওটার সাথে দেখা হওয়া সাংঘাতিক জরুরী, কারণ তাহলে সবাই জানবে রানা সোভিয়েত সীমান্তের দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। রানাকে যারা খুঁজে বের করার কাজে উঠেপড়ে লেগেছে তাদের মনে এই ধারণাটা পাকা করতে চায় ও।

থ্রটল একটু টেনে নিল ও, স্পীড রাখল ঘণ্টায় ছয়শো পঞ্চাশ নটের সামান্য একটু বেশি। ইচ্ছে করলেই সুপারসোনিক স্পীড তুলতে পারে রানা, কিন্তু পনেরো হাজার ফিট ওপর দিয়ে ওড়ার সময় ওই স্পীড তুললে ফেলে আসা পথে যে ফুটপ্রিন্ট থেকে যাবে সেটা একটা মস্ত তীরচিহ্নের মত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে মিগ-৩১-কে। শব্দ শুনে তাকাবে সবাই, চোখ তুলেই দেখতে পাবে।

তেইশ মিনিট পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

এয়ারকিঙের সমস্ত ইকুইপমেন্ট খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে রানা। এগুলোর বেশিরভাগই, বিশেষ করে রাডার আর কম্যুনিকেশন সিস্টেম, সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে যে ডামি তৈরি করা হয়েছিল তাতে আগেই দেখেছে রানা। এসব ইকুইপমেন্টের রুশ আর মার্কিন মান প্রায় সমানই। সি.আই.এ. আর জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স এগুলোর লোভে মিগ-৩১ চুরি করার প্ল্যান করেনি। চুরি করতে চাওয়ার একটা কারণ এয়ারকিঙের এক জোড়া মহাশক্তিধর টারমানস্কি টারবোজেট, প্রতিটি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডেরও বেশি ধাক্কা সৃষ্টি করতে সক্ষম, যার ফলে অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে এয়ারকিঙের গতি, মাক ফাইভ-কেও ছাড়িয়ে যায়। আরেকটা কারণ এর অ্যান্টি-রাডার সিস্টেম–কোইভিসতু বলে গেছে, ওটা কোন মেকানিক্যাল ব্যাপার নয়। তৃতীয় কারণ এয়ারকিঙে রয়েছে থট-গাইডেড মিসাইল আর কামান।

ওর সামনে পরিষ্কার আকাশ, নিশ্ছিদ্র নীল। পোর্ট সাইডে সূর্য উঠছে, ফ্লাইট হেলমেটের সাথে টিন্টেড মাস্ক থাকায় তীব্র আলো চোখে আঘাত করল না। নিচে রাশিয়ান স্তেপ, দিগন্তরেখা পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। চোখ বা মন টানে, এমন কিছু নেই কোথাও। অবশ্য রানার চোখ ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল থেকে প্রায় নড়লই না, বিশেষ করে রাডারের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ও। যদি কোন প্লেন বা মিসাইল আসে, এই রাডারই ওকে সাবধান করে দেবে। এয়ারকিঙের একটা ই-সি-এম ডিভাইস, কোইভিসতু তার ফাইনাল ব্রিফিঙে যার নামকরণ করেছিল 'নাক', মাটি থেকে পাঠানো রাডার সিগন্যাল বিরতিহীনভাবে মনিটর করছে, কোন সিগন্যাল পেলেই সাথে সাথে জানতে পারবে রানা। এই 'নাক'-এর কোন দরকার আছে বলে মনে করে না ও, কারণ আকাশ বা মাটির কোন রাডার স্ক্রীনে ওকে ধরা যাবে না। কিন্তু কোইভিসতু

বলেছিল, চামড়ার চোখে একবার যদি মিগ-৩১ ধরা পড়ে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক রাডার তৎপরতা শুরু হয়ে যাবে। যে প্লেন থেকে পাইলট মিগ-৩১ দেখতে পাবে, সেটাকে গাইড ধরে নিয়ে রানার পজিশন আর গন্তব্য জানার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে ওরা। কাজেই 'নাক'-এর খুদে স্ক্রীনে সারাক্ষণ চোখ রাখা দরকার, তাহলে জানা যাবে কোথায়, প্যাটার্ন নিয়ে মাটিতে রয়েছে মিসাইল-রাডারগুলো।

ওকে খুঁজে বের করার জন্যে ঠিক কি ধরনের সার্চ শুরু হবে, জানে রানা। রাশিয়ানরা ধরে নেবে, হয় উত্তরে না হয় দক্ষিণে গেছে সে। ইসরায়েলি একজন পাইলট পুব দিকে যাবে না, কারণ ওদিকে পিপলস্ রিপাবলিক অভ চায়না রয়েছে। পশ্চিমে অন্য ধরনের অসুবিধে, পাইলট আর বন্ধু কোন দেশের মাঝখানে পড়বে মস্কো ডিফেন্স। ও জানে, শিকারী ঈগল স্কোয়াড্রন ওর খোঁজে উঠে আসবে আকাশে। রাশিয়ানরা সাউন্ড ডিটেকশন সিস্টেমেরও সাহায্য নেবে, ন্যাটো যার নামকরণ করেছে 'খাড়া কান'। রুশ ভূখণ্ডের অভ্যন্তর ভাগে, যেখানে লোক বসতি কম, রাডারকে ফাঁকি দিয়ে মাটির খুব কাছ দিয়ে উড়ে যাওয়া শত্রু বিমানগুলোকে চিহ্নিত করাই খাড়া কান-এর কাজ। এ ধরনের স্থাপনা সংখ্যায় কত রানার জানা নেই, জানা নেই ঘণ্টায় ছয়শো মাইলেরও বেশি গতিতে ছুটে চলা একটা মেশিনের নির্ভুল বেয়ারিং সংগ্রহ করা খাড়া কানের পক্ষে সম্ভব কিনা। আরেকটা ব্যাপার, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফী, হাইস্পীড আর ইনফ্রারেড। ওর ফ্লাইটের টাইম-স্কেল খুবই ছোট, সিস্টেমটা ওরা মিগ-৩১-এর বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারবে কিনা কে জানে। এই ব্যাপারটা দুশ্চিন্তার একটা কারণ হয়ে থাকবে। সন্দেহ নেই, একটা ইলেকট্রনিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে ও।

রিফুয়েলিং পয়েন্টের ধরন, সঠিক পজিশন জানা নেই ওর।

ইউ-এইচ-এফ চ্যানেল খুলে রেখেছে ও, জানে, বিলিয়ারস্ক থেকে ওর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হবে। আসলে যোগাযোগ করা হবে এই আশায় অপেক্ষা করছে ও। একবার মুখ খুললেই, দুশো মাইলের মধ্যে ইউ-ডি-এফ ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছে এমন যে-কেউ শুধু যে ব্রডকাস্ট শুনতে পাবে তা নয়, অপর দুটো ফিক্স লাইনের সাহায্য নিয়ে প্রায় সেই মুহূর্তে ওর সঠিক পজিশনও জেনে ফেলবে। তাতে ওর লাভ হবে এই ও যে দক্ষিণে যাচ্ছে সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে ওদের কাছে।

বিলিয়ারস্ক যোগাযোগ করতে দেরি করছে, কারণটা আন্দাজ করতে পারল রানা। কন্ট্রোল টাওয়ার নিশ্চুপ বসে আছে, কারণ ফার্স্ট সেক্রেটারির ব্যক্তিগত বাহন টুপোলেভ রয়েছে ওখানে। টুপোলেভের ওঅর কমান্ড সেন্টার থেকে যোগাযোগ করা হবে, সময় তো একটু লাগবেই। ফার্স্ট সেক্রেটারি ছাড়াও কে.জি.বি. চীফ, যুদ্ধমন্ত্রী আর এয়ার মার্শাল আছেন টুপোলেভে। প্রথমে পরিস্থিতি বুঝবেন ওঁরা, এক-আধটু যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হবে না তা-ও নয়।

কে কথা বলবেন ওর সাথে? ফার্স্ট সেক্রেটারি? ভদ্রলোকের গলা শুনলেই চিনতে পারবে রানা। রেডিওতে তাঁর ভাষণ, সাক্ষাৎকার বেশ কয়েকবারই শুনেছে ও। উলরিখ বিয়েগলেভ নিশ্চই কথা বলবেন না, কারণ সে-সুযোগ তাঁকে দেয়া হবে বলে মনে হয় না। ফার্স্ট সেক্রেটারি যদি কথা বলতে অনীহা প্রকাশ করেন, তাহলে যুদ্ধমন্ত্রী আর এয়ার মার্শালের মধ্যে থেকে একজন কথা বলবেন।

রানা জানে, হুমকি দেয়া হবে তাকে। ভয় দেখিয়ে বলা হবে, ভালয় ভালয় ফিরে এসো, তা না হলে সোভিয়েত সীমান্ত পেরোবার আগেই তোমাকে আমরা মিগ-৩১ সহ ভস্ম করে দেব। হয়তো চুপ করে থাকবে ও, কারণ ওর খুব ভাল করেই জানা

আছে যে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে তা খুব সহজেই সম্ভব।

প্রাণ ফিরে পেয়ে ঘড় ঘড় করে উঠল রেডিও। কণ্ঠস্বর কানে ঢোকা মাত্র চিনতে পারল রানা। সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি। নিজের অজান্তেই রানা ইন্সট্রুমেন্টের ওপর চোখ বুলাল–হেডিং আর স্পীড চেক করল, পরীক্ষা করল গজগুলো।

'ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই, মি. পিটি ডাভ,' ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে কোন রাগ বা বিদ্বেষ নেই, রয়েছে নিখাদ প্রশংসা। রীতিমত বিস্মিত আর মুগ্ধ হলো রানা। 'আপনার এই সাফল্যের সত্যি কোন তুলনা হয় না। যে দেশেরই নাগরিক হন আপনি, আপনি সে-দেশের গর্ব। ভাববেন না কোন স্বার্থবুদ্ধির কারণে আপনার প্রশংসা করছি আমি। স্বার্থের দিকটা দেখার জন্যে আরও লোক আছে এখানে–আপনিও আশা করি বুঝবেন, সে-ভূমিকায় আমাকে মানায় না।'

একটা ব্যাপার লক্ষ করল রানা, ওর পরিচয় ওরা জানে না। পিটি ডাভ কোন্ দেশের নাগরিক তা-ও সম্ভবত এখনও জানতে পারেনি।

'ধন্যবাদ, মি. ফার্স্ট সেক্রেটারি,' বলল রানা। 'বলুন, আমি শুনছি।'

'কেমন লাগছে, মি. ডাভ? ফ্লাইট এনজয় করছেন? আমাদের নতুন খেলনা সম্পর্কে কোন মন্তব্য আশা করতে পারি?'

'এটাকে আরও উন্নত করা সম্ভব,' বলল রানা।

'ধন্যবাদ, মি. ডাভ–একজন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য আমাদের উপকারে আসবে।'

কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পেল রানা–চৌকো একটা মুখ,

নাকের গোড়ায় সোনালি ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা, চোখ দুটো খয়েরী, ভাবগম্ভীর চেহারায় ক্ষীণ বিষাদের ছায়া। সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান ফার্স্ট সেক্রেটারি সম্পর্কে পুঁজিবাদী দুনিয়ার কূটনীতিকরাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শোনা যায় তিনি শুধু বিচক্ষণই নন, মহত্ত্ব আর উদারতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আলোচনায় তিনি আগ্রহী, তৃতীয় বিশ্বের প্রতি তাঁর সহানুভূতি রয়েছে, আর পরবর্তী বংশধরদের জন্যে সুন্দর, শান্তিময়, সংঘাতহীন একটা বিশ্ব রেখে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ আন্তরিক বলেই সবার ধারণা।

এই মুহূর্তে টুপোলেভের ওঅর কমান্ড সেন্টারে বসে রয়েছেন তিনি, সামনে ট্র্যান্সমিটার সেট। তার চারপাশে কি ঘটছে তাও আন্দাজ করতে পারল রানা। মন্ত্রী আর কর্মকর্তারা সবাই ব্যস্ত, কেউ টেলিফোনে কথা বলছেন, কেউ ম্যাপের ওপর চোখ রেখে মিসাইল ঘাঁটি আর ফাইটার স্টেশনগুলো খুঁজে নিচ্ছেন। এরই মধ্যে, কোন সন্দেহ নেই, চুরি যাওয়া মিগ-৩১-এর যে ফিক্স ওরা সংগ্রহ করেছে, সেটা বিশদভাবে লিখে ফার্স্ট সেক্রেটারির চোখের সামনে ধরা হয়েছে। অবশ্য এই মুহূর্তে শুধু ওদের দু'জনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। একজন রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী প্লেনে, আর তার প্রতিপক্ষের হাতে রয়েছে একজন দেবতার প্রায় সমস্ত ক্ষমতা। কিন্তু তবু সবগুলো কার্ড রয়েছে রানারই হাতে। ও জানে মুখে যত মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলা হোক, ওর খোঁজে পাগলা কুকুর হয়ে উঠবে সোভিয়েত সমরবিদরা, আর খোঁজ পাবার সাথে সাথে...

নিজের অজান্তেই একবার শিউরে উঠল রানা। বলল, 'আর কিছু বলবেন, মি. ফার্স্ট সেক্রেটারি?'

রানাকে অবাক করে দিয়ে ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন, 'না। ধন্যবাদ।'

'আপনি আমাকে ভয় দেখাতে চান না?'

ফার্স্ট সেক্রেটারির সকৌতুক হাসি শুনতে পেল রানা। তারপর তিনি বললেন, 'না, চাই না। কারণ ভয় বা বিপদ কোথায়, কতটুকু, সবই আপনি জানেন, মি. ডাভ। যদি অনুমতি দেন, আমি শুধু আপনাকে কিসে আপনার ভাল হবে সেটুকু বলতে পারি।'

'প্লীজ, মি. ফার্স্ট সেক্রেটারি।'

'আবারও বলছি, আপনার এই সাফল্যের কোন তুলনা হয় না। দুনিয়াটাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেয়ার ক্ষমতা রাখি আমরা, সেই আমাদের ঘরের ভেতর ঢুকে মিগ-৩১ চুরি করে নিয়ে গেছেন আপনি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার প্রশংসা করার মত ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু সেই সাথে এ-ও সত্যি যে আসলে আপনি আংশিক সাফল্য অর্জন করেছেন। চুরি করেছেন, কিন্তু ওটা নিয়ে এখনও আপনি সোভিয়েত রাশিয়া থেকে বেরিয়ে যেতে পারেননি। তা কখনও পারবেনও না। এক কথায় তা সম্ভব নয়।'

একটা ঢোক গিলল রানা। এই কথাগুলো শুনবে বলেই আশা করছিল ও। কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ একটু ব্যঙ্গ মেশানো বিস্ময় ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল ও, 'তাই নাকি?'

'আপনাকে আবার বিলিয়ারস্কে ফিরিয়ে আনতে মাত্র চল্লিশটা ফ্লাইট মিনিট লাগবে আমাদের,' বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'গোটা ব্যাপারটা অঙ্কের মত—দুয়ে দুয়ে চার যদি সত্যি হয়, চুরি যাওয়া মিগ-৩১ বিলিয়ারস্কে ফিরে আসবে এ-ও সত্যি। এখন প্রশ্ন হলো, আপনি স্বেচ্ছায় ফিরে এসে ক্ষমা পাবার সুযোগ নেবেন, নাকি আপনাকে ফিরে আসতে বাধ্য করতে হবে?'

'স্বেচ্ছায় যদি না ফিরি?'

'আপনি বোকা এ আমি বিশ্বাস করি না।'

‘কিন্তু মিগ-৩১ যে জাদু করেছে আমাকে,’ রসিকতা করল রানা। ‘সত্যি বলছি, আপনাদের এই খেলনা সাংঘাতিক ভাল লেগে গেছে আমার। প্লেনটার সাথে আমাকে মানিয়েছেও দারুণ।’ তারপর আবদারের সুরে বলল, ‘এটা আমি রাখতে চাই।’

‘দ্বন্দ্বটাই তো এখানে। আপনি রাখতে চান, আমরাও রাখতে চাই। ভেবে দেখুন, কয়েক বিলিয়ন রুবল খরচ করা হয়েছে এই প্রজেক্টে। তা না হয় চুলোয় যাক। কিন্তু আরও ভাবুন, আপনি যদি সত্যি ওটা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারেন, দুনিয়ার কাছে আমরা মুখ দেখাব কিভাবে?’ এক সেকেন্ড থামলেন তিনি, তারপর আবার কথা বললেন, ‘বুঝতে পারছেন তো, ওটা আমরা কোন অবস্থাতেই হারাতে পারি না।’

‘আমি স্বেচ্ছায় না ফিরলে কি হবে তা কিন্তু বলেননি।’

‘কেন আপনি আন্দাজ করতে পারেন না?’ পাল্টা প্রশ্ন করলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। ‘আপনাকে ফিরিয়ে আনার সব চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, সীমান্ত পেরোবার আগেই মিগ-৩১ ধ্বংস করে দেয়া হবে। দুঃখিত মি. ডাভ, আমাদের আর কোন উপায় থাকবে না।’

‘ঝুঁকিটা তবু আমি নেব, ফার্স্ট সেক্রেটারি,’ বলল রানা। ‘মুশকিল কি জানেন, কোন কাজ আমি অসমাপ্ত রাখতে পারি না। হয় সম্পূর্ণ সফল হব, নয়তো একেবারে হেরে ভূত হয়ে যাব।’

ঠাণ্ডা সুরে ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন, ‘আপনার যেমন অভিরুচি।’

নিজের পরিচয় বা মিগ-৩১ হাইজ্যাক করার উদ্দেশ্য ওদেরকে জানাতে পারে রানা, কিন্তু মেজর জেনারেল রাহাত খানের নিষেধ আছে। ওদেরকে সব কথা ব্যাখ্যা করে বললে ওরা হয়তো বিশ্বাসই করবে না, ভাববে ওদেরকে দ্বিধার মধ্যে ফেলে দিয়ে পালাবার পথটা নিষ্কণ্টক করতে চাইছে ও। কিংবা বিশ্বাস

করলেও, স্রেফ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রক্ষার জন্যে, মিগ-৩১-কে আকাশেই ওরা ধ্বংস করে দেবে—বাংলাদেশ একটা গুরুতর বিপদ থেকে ওদেরকে বাঁচিয়েছে সেটা ওরা বিবেচনা করে দেখবে না। তাছাড়া, আরও একটা কারণ আছে। ওদের দু'জনের এই আলাপ স্যাটেলাইট ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারও নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছে। ও পিটি ডাভ নয় এ কথা ফাঁস হয়ে গেলে রিফুয়েলিং পয়েন্টে পৌঁছেই বিপদে পড়ে যাবে রানা—মিগ-৩১ নিয়ে ঘরে আর ফেরা হবে না।

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. ফার্স্ট সেক্রেটারি,' বলল রানা। 'আমার জন্যে আপনি মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

'গুড লাক, মি. ডাভ,' বলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি।

ইউ-এইচ-এফ অফ করে দিয়ে আপন মনে হাসল রানা। ভাবল, সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা বিলিয়ারস্কের পিপি টু-কে নিয়ে। অনেকগুলো অসাধারণ সুবিধা ভোগ করছে ও, সেগুলো সবই বাতিল করে দিতে পারে দ্বিতীয় মিগ-৩১। ওরা যদি প্রথমটার পিছনে দ্বিতীয়টাকে লেলিয়ে দেয়...

সিভিলিয়ান ফ্লাইটটা আচমকা এসে পড়ল। বিস্ময় আর ভয়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা, মিগ-৩১ অনেকটা ওপরে রয়েছে তাই, তা না হলে সামনাসামনি সংঘর্ষ হত। মস্কো থেকে ভলগোগ্রাদ যাচ্ছে ওটা। রানার চোখ রাডারে ছিল না, অনেক নিচে অ্যালুমিনিয়ামের ওপর সূর্যের আলো ঝিক করে ওঠায় দেখতে পেল ওটাকে। সকালের আকাশে কুয়াশা রয়েছে, তাই ভেপার ট্রেইল চোখে পড়তে দেরি হয়ে গেছে। রানার ইচ্ছে টুপোলেভের নাকের সামনে দিয়ে যাবে। ফ্লাইট ক্রুদের চোখে পরিষ্কার ধরা পড়তে চায় ও। ওরা যেন দেখতে পায় মিগ-৩১

ওদের নাকের সামনে দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে।

অটো পাইলটের সুইচ অফ করে প্লেনের কন্ট্রোল নিজের হাতে নিল রানা। এয়ারকিংকে একটা ডানার ওপর খাড়া করল ও, অনুভব করল প্রেশার স্যুট তার অ্যান্টি-জি ভূমিকা পালন করছে—উরু আর ঊর্ধ্বাঙ্গে এঁটে বসে পরমুহূর্তে ঢিলে হলো। মাটি আর আকাশের দিকে তাক করা ডানা দুটো সোজা হলো, বিশাল একটা ইউ টার্ন নিয়ে প্লেন সিধে করল রানা। টুপোলেভ টি-ইউ-ওয়ান-ফোর-ফোর এখন ওর সামনে। পোর্ট সাইডে কাত হয়ে পড়ল মিগ-৩১, প্রায় খাড়া ডাইভ দিয়ে এয়ারলাইনারের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে ওটা। রাডার স্ক্রীনের প্রায় মাঝখানে সবুজ একটা উজ্জ্বল ব্লিপ। পাশের দিকে যথেষ্ট সরে এসেছে অথচ এখনও এয়ারলাইনারের পিছনে রয়েছে ও। সিদ্ধান্ত নিল, এখুনি সময় ওটাকে ওভারটেক করার। আগের কোর্সে ফিরে এল রানা। দেখল, ব্লিপটা স্ক্রীনের সেন্টার লাইনের একটা শাখার দিকে আবার ফিরে যেতে শুরু করেছে। মিগ-৩১ সোজা করে নিচ্ছে ও, স্টারবোর্ডের দিকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল এয়ারলাইনার। সন্তর্পণে থ্রটল আরও খুলে দিল রানা, লাগামহীন ঘোড়ার মত ছুটল এয়ারকিং, সরাসরি টুপোলেভ-কে লক্ষ্য করে।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো টুপোলেভের গায়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে মিগ-৩১। কিন্তু দূরত্ব, গতি আর দিক সম্পর্কে নিজের হিসেবে রানার কোন সংশয় নেই। আবার ডানা কাত করল রানা, বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসা টুপোলেভের পথ থেকে সরে যেতে শুরু করল—এই মুহূর্তে সেটা এয়ারকিঙের স্টারবোর্ড জানালা জুড়ে রয়েছে।

টুপোলেভের ফ্লাইট ক্রুরা হতভম্ব হয়ে গেছে। তাদের কাছে এটা স্রেফ একটা ভৌতিক কারবার। রাডার স্ক্রীনে কিছু নেই অথচ

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত হঠাৎ নেমে এল পারদের মত চকচকে একটা অচেনা প্লেন। ভয়ে, বিস্ময়ে, আতঙ্কে অন্তত কয়েক সেকেন্ড পাথর বনে যাবে ওরা।

ডাইভ দিয়ে অনেক নেমে এল রানা, টুপোলেভের এক হাজার ফিট নিচে। এয়ারলাইনারের ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্র্যান্সমিটারের কাঁটা স্থির হতেই শুনতে পেল একসাথে সবাই চিৎকার করছে ক্রুরা।

নিচের মাটি সবেগে উঠে এল এয়ারকিঙের দিকে। ডাইভ দিয়ে এখনও নেমে যাচ্ছে রানা। ক'সেকেন্ড পর নাক একটু উঁচু করল, তারপর সিধে করে নিল প্লেন। মাটি এখন দুশো ফিট নিচে। দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে গেছে রাশিয়ান স্তেপ। কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর চোখ বুলিয়ে সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিল রানা।

নতুন একটা কোর্স ধরল মিগ-৩১। প্লেনের নিয়ন্ত্রণ অটো-পাইলটের হাতে ছেড়ে দিল রানা। ওদের চোখে ধরা দিয়েছে ও, সোভিয়েত সমরবিদরা এখন জানবে চুরি যাওয়া মিগ-৩১ দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে। ওরা ধরে নেবে ভলগোগ্রাদ পেরিয়ে সীমান্ত টপকাবার চেষ্টা করবে রানা, ইরান হয়ে চলে যেতে চাইবে ইসরায়েলে। সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তার সর্বশক্তি দিয়ে ওদিকটা গার্ড দেবে এবার।

এয়ারকিঙের বিস্ময়কর গতির কিছুটা এবার কাজে লাগাবে রানা। থ্রটল খুলে দিয়ে আর. পি-এম গজের ওপর দিকে ওঠা চাক্ষুষ করল ও। মাক-কাউন্টারের ওপরও চোখ রাখল একটা। দেখল, শব্দের গতির চেয়ে দ্রুত ছুটছে ওর বাহন।

উরাল পর্বতমালার দিকে ছুটছে এয়ারকিং, তারমানে পুবদিকে। উত্তর-মুখো হবার আগে এই পর্বতমালার আড়ালটুকু একান্ত দরকার ওর।

এয়ারকিঙের সবটুকু গতি ব্যবহার করার উপায় নেই। তবে

মাক-কাউন্টারে সংখ্যাগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে দেখে তৃপ্তি বোধ করল ও।–মাক ওয়ান, ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান, ওয়ান পয়েন্ট টু, ওয়ান পয়েন্ট থ্রী, ওয়ান পয়েন্ট ফোর, ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ...

ওর নিচে অনুর্বর, বৃক্ষহীন, ধু-ধু প্রান্তর, দ্রুত গতিতে পিছিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত একটা গর্বে বুক ভরে উঠল ওর। দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা যুদ্ধ-বিমান চালাচ্ছে সে। সি.আই.এ. আর জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এসেছে বিলিয়ারস্ক থেকে। নিরাপদ আশ্রয় এখনও বহু দূরে, কিন্তু এখন পর্যন্ত যা করেছে ও তা-ও কম নয়। বাংলাদেশ গরীব হতে পারে, কিন্তু বাঙালীর সৎ সাহসের অভাব নেই–এটুকু অন্তত নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা গেছে। প্রমাণ করা গেছে চ্যালেঞ্জ করলে উপযুক্ত জবাব দেয়ার সামর্থ্য বাংলাদেশ রাখে।

মাটি থেকে মাত্র দুশো ফিট ওপর দিয়ে ছুটছে মিগ-৩১, সুপারসোনিক ফুটপ্রিন্ট তাই নিতান্তই সরু, তাছাড়া প্লেনের নিচে থেকে সেটা লক্ষ্য করার জন্যে কোথাও কোন জনবসতি নেই। এখন শুধু ওকে 'খাড়া কান' সাউন্ড ডিটেকশন নেটওয়র্ককে এড়িয়ে যেতে হবে। এই নেটওয়র্কের পজিশন, রেঞ্জ বা ক্ষমতা জানা নেই ওর। তবে আশার কথা এই যে উরালের মত পার্বত্য এলাকায় এত নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় মিগ-৩১ যে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করবে সেগুলো এ-ধরনের যে-কোন স্পর্শকাতর ইকুইপমেন্টকে বিভ্রান্ত না করে পারে না।

'আপনি আংশিক সাফল্য অর্জন করেছেন...' ফার্স্ট সেক্রেটারির কথাটা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ একটা আতঙ্ক বোধ করল রানা।

মিগ-৩১ নিয়ে আবার যদি বিলিয়ারস্ক ফিরে যেতে হয়, চুন-কালি পড়বে মুখে, শাস্তি আর অপমানের কথা না হয় বাদই দেয়া গেল। কিংবা যদি রাশিয়ান সীমান্ত পেরোবার আগে বা পরে মিগ-

৩১ ধ্বংস করে দেয়া হয়.·· মনের নিষেধ অগ্রাহ্য করে থ্রটল সামনে ঠেলে দিল ও, চোখ রাখল মাক-কাউন্টারে। সংখ্যাগুলো সরে যেতে লাগল—মাক ওয়ান পয়েন্ট এইট, ওয়ান পয়েন্ট নাইন, মাক টু, টু পয়েন্ট ওয়ান, টু পয়েন্ট টু.··

জানে, মহামূল্যবান ফুয়েল অপব্যয় করছে ও অথচ থ্রটল টেনে নেয়ার কথা ভাবতেও চাইল না। মাক টু পয়েন্ট সিক্স পর্যন্ত উঠল গতি। হ্যাঁ, এবার হয়েছে। এই নির্দিষ্ট গতিতে প্লেন সেট করে নিচে তাকাল ও। রোদ মোড়া ধু-ধু প্রান্তর ঝাপসা একটা ম্লান ঝলকের মত লাগল চোখে। ও যেন শব্দহীন একটা নারকেলের ভেতর রয়েছে, বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। টি-এফ-আর (টেরেন ফলোইং রাডার) অন করে নিরাপদ বোধ করল ও। উরাল পর্বতমালার পাদদেশে না পৌঁছুনোর আগে এটা ব্যবহার করার কথা চিন্তা করেনি ও। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিই ওকে বাধ্য করল সুইচ অন করতে—ঘণ্টায় দু'হাজার মাইল স্পীডে ছুটছে মিগ-৩১।

ও আর এখন এয়ারকিং চালাচ্ছে না। উরাল আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। ধীরে ধীরে নিরাপত্তা বোধ ফিরে এল মনে। মাক-কাউন্টারে টু পয়েন্ট সিক্স জ্বলজ্বল করছে। ফুয়েল যতই খরচ হোক, এই স্পীডে এয়ারকিংকে চামড়ার চোখে দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

তারপর দেখা যাবে কপালে যা আছে।

তিন

'কনটিনজেন্সি রিফুয়েলিং পয়েন্টগুলোকে অ্যালার্ট থাকতে বলুন!'

সি. আই.এ. চীফ রবার্ট মরগ্যান নির্দেশ দিলেন। একটা স্ক্র্যাম্বলার সেটের সাহায্যে এয়ার কমোডর কাপলানের সাথে কথা বলছেন তিনি। এইমাত্র এয়ার কমোডর তাঁকে খবর দিয়েছেন, চারদিক থেকে যে-সব রিপোর্ট আসছে তাতে প্রায় নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া চলে যে বিলিয়ারস্ক থেকে মিগ-৩১ নিয়ে আকাশে উড়তে পেরেছে পিটি ডাভ। এ-ই-ডব্লিউ-আর (এয়ারবোর্ন আর্লি ওয়ার্নিং রাডার) থেকে পাওয়া রিপোর্টে জানা গেছে, সোভিয়েত রেড এয়ারফোর্সের ঝাঁক ঝাঁক বর্ডার স্কোয়াড্রন সীমান্তে আর সীমান্তের ভেতর দিকে দুটো পাঁচিল তুলে দিয়েছে। রেডিও আর কোড-মনিটরিং রিপোর্ট হলো, রেড এয়ারফোর্সের সেকশনগুলো পরস্পরের সাথে রেড ব্যানার নর্দার্ন ফ্লিট আর অ্যাডমিরালের সাথে ফার্স্ট সেক্রেটারি, এবং এই দু'জনের সাথে ভূমধ্যসাগরে টহলরত যুদ্ধ-জাহাজগুলো বিরতিহীন-কোড-কমিউনিকেশন চালু করেছে। এসব থেকে একটা সত্যই বেরিয়ে আসে—বিলিয়ারস্ক থেকে এয়ারকিং নিয়ে নিরাপদে পালাতে পেরেছে পিটি ডাভ।

এক মিনিট পর এয়ার কমোডর জানালেন, দুটো রিফুয়েলিং পয়েন্টকেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বিশেষ একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে হোমিং-সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করতে শুরু করেছে ওরা, পিটি ডাভের ব্লিপারে সেটা পরিষ্কার ধরা পড়বে। এয়ার কমোডর জানতে চাইলেন, 'জননী-২ আর জননী-৩, এ-দুটোর দায়িত্ব আমার, কিন্তু জননী-১? ওটার লোকেশনই আমার জানা নেই...'

মোট তিনটে রিফুয়েলিং পয়েন্ট, দুটোর কথা এয়ার কমোডর কাপলানকে না জানিয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু তিন নম্বরটার কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। নৌ-বাহিনীর কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে ওটাকে পরিচালনা করছে সি.আই. এ। রবার্ট মরগ্যান বললেন, 'এক-কে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না।

ক্যাপ্টেন টলব্যাট আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে ওটার দায়িত্ব পালন করবে।' টলব্যাট নেভীতে ক্যাপ্টেন ছিল, বর্তমানে সি.আই. এ-র গুরুত্বপূর্ণ অফিসার। 'ধন্যবাদ, এয়ার কমোডর। আপনি যে খবর দিলেন, মিষ্টি রোদের মত লাগল আমাদের। অসংখ্য ধন্যবাদ।' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি। এই সময় তাঁর কাঁধে একটা হাত পড়ল। ঘুরলেন মরগ্যান, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে দেখে মৃদু হেসে অভয় দিলেন, তাঁকে, বললেন, 'হ্যাঁ, প্রেসিডেন্টকেও সুখবরটা জানাতে পারেন এখন। পিটি ডাভ বিলিয়ারস্ক থেকে নিরাপদে উঠে গেছে। মিগ-৩১ নিয়ে, অবশ্যই!'

খবরটা শুনে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের চীফ আইজ্যাক ময়নিহান আনন্দে আটখানা হলেন। তাঁর জায়গায় আর কেউ হলে যা করতে পারত না, তিনি তাই করে বসলেন—পরিবেশ, পদ আর মর্যাদার কথা ভুলে আচমকা ঠাস ঠাস শব্দে হাততালি দিতে শুরু করলেন।

তাঁর দিকে ভুরু কুঁচকে একবার তাকালেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, তারপর সি.আই.এ. চীফকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথাও কোন ভুল হয়নি তো? পিটি ধরা পড়েছে, তাই এই ব্যাপক তৎপরতা, সে রকম কিছু নয় তো?'

হেসে উঠলেন মরগ্যান, অ্যাডমিরালের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'এ-ই-ডব্লিউ রাডার রেড এয়ারফোর্সের অ্যাকটিভিটি কনফার্ম করেছে, মাই ডিয়ার অ্যাডমিরাল। স্কোয়াড্রনগুলো শুধু দক্ষিণ আর উত্তর সীমান্তে টহল দিচ্ছে। এ-থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে পিটি শুধু বিলিয়ারস্ক থেকেই পালায়নি, নিজের কোর্সও গোপন রাখতে পেরেছে—অন্তত এখন পর্যন্ত, তাই নয় কি?'

সি.আই.এ-র এই বিশেষ অপারেশন সেন্টারে পানির মত

সহজে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। ছোট্ট একটা মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে তাঁকে, তাতেই রবার্ট মরগ্যানের সসম্মান আমন্ত্রণ পেয়ে গেছেন তিনি। মরগ্যানকে তিনি টেলিফোনে জানান, প্রেসিডেন্ট শেষ মুহূর্তে সি.আই.এ. আর জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের এই যৌথ অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, এবং জানতে পেরে মনে মনে খুশিও হয়েছেন। আসলে, এ-ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের মৌন সম্মতি রয়েছে। সেই সাথে অ্যাডমিরাল জানান, অপারেশনের অগ্রগতি সম্পর্কে খবর পাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট। ব্যস, আর কি, দারুণ উৎসাহের সাথে অ্যাডমিরালকে প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে হেডকোয়ার্টারে আমন্ত্রণ জানালেন মরগ্যান।

কোথাও থেকে কোন খবর এলেই সেটা প্রথমে অ্যাডমিরালকে জানাচ্ছেন মরগ্যান। আর অ্যাডমিরাল খবরটা প্রেসিডেন্টকে দেয়ার নাম করে সরাসরি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফ, প্রিয় বন্ধু রাহাত খানকে জানিয়ে দিচ্ছেন। ঢাকায় একটা ট্র্যান্সমিটার সেট সামনে নিয়ে অপেক্ষায় আছেন রাহাত খান, এদিকে অ্যাডমিরালের সাথে রয়েছে শক্তিশালী কিন্তু খুদে একটা ট্র্যান্সমিটার। খবর আদান-প্রদানে কোন বাধা নেই। ভার্জিনিয়ার এই অপারেশন সেন্টার যা জানছে, ঢাকায় বসে রাহাত খানও তাই জানছেন, প্রায় একই সাথে।

বিড়বিড় করে আপনমনে কি যেন আওড়ালেন অ্যাডমিরাল।

'কি হলো?' অবাক দেখাল সি.আই.এ. চীফকে।

'ওর জন্যে প্রার্থনা করলাম,' মৃদু কণ্ঠে বললেন জর্জ হ্যামিলটন।

'ওর জন্যে?'

'মানে...পিটির জন্যে,' বলে মুচকি হাসলেন অ্যাডমিরাল।

ওদের পাশে এসে দাঁড়ালেন জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স চীফ।

হে-হে করে হেসে বললেন, ‘আমাদের পিটি, বুঝলেন কিনা, দেশের ছেলে বলে বলছি না, পৃথিবীর সেরা পাইলটদের একজন। দেশে ফিরে আমি প্রস্তাব দেব, ওর নামে একটা এভিনিউ-এর নামকরণ করা হোক। যে জাতি জাতীয় বীরদের সম্মান দেখাতে জানে না...’

জাতীয় বীর? হাসি পেল অ্যাডমিরালের। ভাবলেন, ভায়া ময়নিহান, যদি জানতে কোথায় আছে তোমার পিটি, ভিরমি খেতে। মুখে হাসি টেনে বললেন, ‘গুড আইডিয়া। তবে আমার ধারণা শুধু একটা নামকরণ যথেষ্ট নয়। ওকে বিমান বাহিনীর প্রধান করে দেয়া যায় কিনা...আসলে, ওটাই ওর প্রাপ্য সম্মান।’

চোখে সন্দেহ নিয়ে অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে থাকলেন আইজ্যাক ময়নিহান, কিন্তু অ্যাডমিরালের চেহারায় বিদ্রূপের ছায়ামাত্র নেই দেখে একগাল হাসলেন তিনি, ‘সুন্দর, সুন্দর পরামর্শ, স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বিমান বাহিনী-প্রধান হওয়ার জন্যে ওর বয়সটা খুব কম হয়ে যায়। তাছাড়া...’

ব্যাটা উজবুক, ভাবলেন অ্যাডমিরাল।

মরগ্যান ইঙ্গিতে ডাকলেন টলব্যাটকে। বললেন, ‘জননী-১-কে সতর্ক করে দাও। তার আগে দেখে নেবে ওদিকে আবহাওয়ার কি অবস্থা।’

ওদের সবাইকে সাথে নিয়ে ম্যাপের কাছে ফিরে এল টলব্যাট। একটা পয়েন্টার দিয়ে দেয়ালে সাঁটা স্যাটেলাইট ওয়েদার-ফটোগ্রাফে টোকা দিল সে। ‘এটাই শেষবার এসেছে—আমাদের সময়ে বেলা দুটোয়। সব পরিষ্কার।’

‘জননী-১ এগোচ্ছে কি রকম?’

‘বরফের নিচে দিয়ে এগোচ্ছে,’ বলল টলব্যাট, ‘জমাট বাঁধা বরফ, কিন্তু তেমন পুরু নয়। টেমপারেচার খুব লো। গতি মন্থর, তবে এখনও বাধা পেয়ে থামতে হয়নি কোথাও।’

'গুড,' মাথা ঝাঁকালেন মরগ্যান। 'আর তাহলে দেরি নয়। ওকে তৈরি থাকতে বলে দাও।' অ্যাডমিরালের দিকে ফিরলেন তিনি। 'জননী-১, পিটির রিফুয়েলিং পয়েন্ট।'

এইরকম আরও দু'একটা তথ্য দাও, তারপর আবার একবার বাথরূমে যাব আমি, ভাবলেন অ্যাডমিরাল।

কোড করা মেসেজটা টলব্যাট ট্র্যান্সমিট করার আগেই টেলিটাইপের খই ফোটা আওয়াজে চমকে উঠল সবাই। মেশিনটা থেকে একটা কাগজ খুলে নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল একজন অপারেটর। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'মাত্র মিনিট কয়েক আগে আমাদের কমিউনিকেশন এটা পিক করেছে,' রাত জাগা চেহারায় ক্লান্ত একটু হাসি ফুটল। 'কোড নয়, সাধারণ রুশ ভাষা। একজন অপারেটর সোভিয়েত এয়ারলাইন ফ্রিকোয়েন্সি শুনছিল, তার কানে ধরা পড়েছে।'

'কি?'

'ভলগোগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে মিগ-৩১ দেখা গেছে,' অপারেটর বলল। 'এয়ারলাইনারের নাক আর একটু হলে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। প্লেনটা কোত্থেকে এল, বুঝতেই পারেনি পাইলট। তবে কোন্ দিকে গেছে সেটা পরিষ্কার দেখেছে। এয়ারলাইনারের পাইলট চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছিল, তারপর কেউ তাকে ধমক দিয়ে থামায়।'

অপারেটরের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়লেন মরগ্যান, তারপর সেটা বাড়িয়ে দিলেন অ্যাডমিরালের দিকে। বললেন, 'ভেরি গুড। খুশির খবর হলো, রাশিয়ানরা যা কিছু করছে সব দক্ষিণে।'

কাগজ থেকে চোখ তুলে জর্জ হ্যামিলটন বললেন, 'কিন্তু আমার ভয় খাড়া কান-কে নিয়ে। পুব দিকে যাচ্ছে পিটি, উরালের দিকে, তাই না? ওর মিগ-৩১ বিপজ্জনক আওয়াজ করছে।'

গম্ভীর মুখে মরগ্যান শুধু একবার মাথা ঝাঁকালেন।

মুচকি মুচকি হাসছেন আইজ্যাক ময়নিহান। 'আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই, পিটিকে আপনারা চেনেন না। অসাধ্য সাধন করতে পারবে জেনেই ওকে আমরা নির্বাচন করেছি।'

ব্যাটা উজবুক–এই মুহূর্তে আর কোন বিশেষণ খুঁজে পেলেন না অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

এক এক করে ছয়টা প্রস্তাবই বাতিল করে দিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। দুটো প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিলিয়ারস্ক থেকে মিগ-৩১ নিয়ে পালিয়ে যাবার প্রতিশোধ হিসেবে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হেডকোয়ার্টার বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হোক, আর সেই সাথে ইউ.এস. এয়ারফোর্সের বিমানবাহী জাহাজ আটলান্টিসকে হাইজ্যাক করে রাশিয়ান কোন বন্দরে নিয়ে আসা হোক। দুটো কাজই পানির মত সহজ। তেল আবিবে কে.জি.বি-র এজেন্টরা রয়েছে, আধঘণ্টার নোটিসে যে-কোন বিল্ডিং বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারবে তারা। আর ইউ.এস. এয়ারফোর্সের বিমানবাহী জাহাজ আটলান্টিসের আশপাশে রয়েছে সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর গোটা তিনেক পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন, দুটো ডেস্ট্রয়ার, চারটে গানবোট। শুধু তাই নয়, আটলান্টিসের অফিসার পদে তিনজন লোক রয়েছে, যারা কে.জি.বি-র যে-কোন নির্দেশ কোন প্রশ্ন না তুলে পালন করবে। বলাই বাহুল্য, প্রস্তাব দুটো এল কে.জি.বি-চীফ উলরিখ বিয়েগলেভের কাছ থেকে।

বাকি চারটে প্রস্তাবও কমবেশি এই একই ধরনের, প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তোলা হয়েছে।

ধৈর্য ধরে সবগুলো প্রস্তাব শুনলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। তারপর বললেন, 'না।'

টুপোলেভের ওঅর কমান্ড সেন্টারে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

সেই নিস্তব্ধতা ফার্স্ট সেক্রেটারি ভাঙলেন, 'কারণ, এটাকে কোনভাবেই যুদ্ধ পরিস্থিতি বলা চলে না।'

যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল বাকুনিন ইউরোপিয়ান রাশিয়ার ম্যাপের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। একদিকে পোলিশ সীমান্ত থেকে উরাল পর্যন্ত, আরেক দিকে আর্কটিক ওশেন থেকে ব্ল্যাক সী পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। ম্যাপের ওপর খুদে আলোকবিন্দু দিয়ে তৈরি অনেকগুলো মালা, পিট পিট করা প্রতিটি আলোকবিন্দু এক একটা ইন্টারসেপটর স্টেশন, প্রতিটি স্টেশন থেকে ফাইটার স্কোয়াড্রনগুলো ইতোমধ্যে উঠে গেছে আকাশে। জ্বলজ্বলে মালাগুলোর সাথে অন্যান্য রঙের আরও রেখা এগিয়ে এসে জোড়া লাগছে, তারমানে মিসাইল সাইটগুলো পূর্ণ সতর্কাবস্থায় রয়েছে। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছেন বাকুনিন, সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই যেন প্রথম চাক্ষুষ করছেন তিনি। গর্বে, অবিশ্বাসে তাঁর চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মুখ তুলে ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে তাকালেন তিনি। 'কিন্তু এ-কথাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি, আমেরিকানরা আমাদেরকে ব্লাফ দিতে চাইছে কিনা। আমাদের সমস্ত মনোযোগ থাকবে চোরের দিকে, ওদিকে হয়তো উত্তর দিক থেকে হামলা করবে ডাকাতরা?'

ফার্স্ট সেক্রেটারিকে বিরক্ত দেখাল। 'যদি করে, সে খবর তো সবচেয়ে আগে আপনারই পাবার কথা, কমরেড বাকুনিন,' বললেন তিনি। 'আমি তো জানি শত্রুরা কেউ সোভিয়েত সীমান্ত দিয়ে একটা আলপিন ঢোকাবার প্রস্তুতি নিলেও সাথে সাথে সে-খবর আমরা পেয়ে যাব। নাকি আমার জানার মধ্যে ভুল আছে?'

'আপনি ঠিকই জানেন, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি,' বাকুনিন তাড়াতাড়ি বললেন। 'আমাদের সেনাবাহিনীকে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় থাকতে বলার জন্যে আমি শুধু আপনার অনুমতি চাইছি।'

'স্থল, নৌ আর বিমান বাহিনীকে?'

'জ্বী।'

'তার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না,' শান্ত সুরে বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'আমি আবারও বলছি, এটা যুদ্ধ নয়। মিগ-৩১ চুরির পিছনে আমেরিকানরা আছে, কোন সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস, এর সাথে ব্রিটেনও জড়িত। ইসরায়েলকে আসলে ওরা ব্যবহার করছে ঘুঁটি বা উপকরণ হিসেবে, তার বেশি কিছু না। মিগ-৩১ আমেরিকানদের খুবই দরকার, তাই ওরা মরিয়া হয়ে এই অপারেশনে হাত দিয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্লেনটা ওরা না পেলে রাশিয়ার ওপর হামলা করে বসবে। আমি আসলে বলতে চাইছি, মিগ-৩১ যদি বিলিয়ারস্ক ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়, বা শেষ পর্যন্ত যদি মাঝ আকাশে আমরা ওটাকে ধ্বংস করে দিই, দেখবেন, আমেরিকানরা টুঁ শব্দটিও করবে না। কিল খেয়ে কিল হজম করবে ওরা।'

সাদা কোট পরা একজন কে.জি.বি. অফিসার ঢুকল ভেতরে। টেবিলে কিছু কাগজ রেখে ফিরে গেল সে। এয়ার মার্শাল ঝনঝেনিৎসিন সেগুলোর ওপর চোখ বুলালেন। 'দ্বিতীয় মিগ-৩১-এর ড্যামেজ রিপোর্ট, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি। আগুন ওটার তেমন কোন ক্ষতি করতে পারেনি।'

'ফ্লাইটের জন্যে তৈরি হতে কতক্ষণ লাগবে ওটার?'

'এক ঘণ্টা, কমও হতে পারে,' এয়ার মার্শাল কাগজগুলোর ওপর চোখ রেখে বললেন। 'পিপি ওয়ানের মত এটাও ফ্লাইটের জন্যে তৈরি হয়েই ছিল, কিন্তু এখন ফোম পরিষ্কার করতে হবে, আর আর্মস দিয়ে সাজাতে হবে।'

জেনারেল বাকুনিন বললেন, 'যদি জানা যেত পিপি ওয়ান ঠিক কোথায় আছে...!' তাঁর গলায় হতাশার সুর।

রাডারে ধরা পড়ে না, মিগ-৩১-এর এটাই হলো সবচেয়ে বড়

বৈশিষ্ট্য, ভাবলেন ঝনঝেনিৎসিন। মন খুঁত খুঁত করছে তাঁর। কেবলই মনে হচ্ছে, রাডারে ধরা না পড়লেও মিগ-৩১-কে খুঁজে বের করা সম্ভব। কিভাবে? ক'সেকেন্ড গভীর ভাবে চিন্তা করতেই বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ল। ইনফ্রা-রেড! ইনফ্রা-রেড ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট আকাশে বা মাটিতে তাপের উৎস খুঁজে ফেরে। একটা জেট ইঞ্জিনের তাপ যে-কোন ইনফ্রা-রেড স্ক্রীনে কমলা রঙের ব্লিপ হয়ে ধরা পড়বে। সেই ব্লিপ দেখে ফাইটার স্কোয়াড্রনের পক্ষে পিছু নেয়া বা লক্ষ্যস্থির করা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, মিগ-৩১ রাডারকে ফাঁকি দেয়ার যে বিস্ময়কর সুবিধেটা ভোগ করছে সেটা ইনফ্রা-রেড প্রায় সম্পূর্ণটাই বাতিল করে দেবে। ঘাঁটিগুলোতে রয়েছে তাপ সন্ধানী মিসাইল, ওগুলো ছুঁড়লে...

উত্তেজনায় হাত দুটো মুঠো হয়ে গেল এয়ার মার্শালের। সাদা কোট পরা একজন অপারেটর তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। সমাধান পাওয়া গেছে, তিনি ভাবলেন। তাপপ্রিয় মিসাইল রয়েছে ফাইটার স্কোয়াড্রনগুলোতেও, খালি চোখে কেউ দেখতে পাবে তার জন্যে অপেক্ষা করার কোন দরকারই নেই পাইলটদের। প্রতিটি ফাইটারের সামনের দিকে রয়েছে ইনফ্রা-রেড উইপনস-এইমিং সিস্টেম, ওটার সামনে দিয়ে জেট ইঞ্জিন নিয়ে যেই যাক না কেন, পাইলটের ইনফ্রা-রেড ডিটেকশন স্ক্রীনে উজ্জ্বল কমলা রঙের ব্লিপ হয়ে ধরা পড়বেই।

সশ্রদ্ধ একটা কণ্ঠস্বর এয়ার মার্শালের ধ্যান ভেঙে দিল। মুখ তুলে ভুরু কোঁচকালেন তিনি, জানতে চাইলেন, 'কি চাও?'

অপারেটরের চোখে বিজয়ের উল্লাস। 'ওরস্ক-এর পশ্চিমে, একটা মোবাইল ইউনিট থেকে রিপোর্ট করা হয়েছে, এয়ার মার্শাল। একেবারে নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া একটা এয়ারক্রাফটের

আওয়াজ রেকর্ড করেছে ওরা। গতি...মাক টু-র চেয়েও বেশি।'

'ওরস্কের কোথায়?' উত্তেজনায় টেবিলের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন এয়ার মার্শাল, সটান উঠে দাঁড়ালেন। চোর হলেও, পিটি ডাভের ওপর শ্রদ্ধা বোধ করলেন তিনি। ভাব দেখিয়েছে যেন দক্ষিণে যাচ্ছে সে, অথচ আসলে তা সে যাচ্ছে না। পাইলটের জায়গায় তিনি নিজে হলে যে কৌশলটা খাটাতেন, এই ছোকরা ঠিক সেটাই খাটিয়েছে। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ম্যাপ কনসোলে বসা লোকটার দিকে ফিরলেন তিনি, নির্দেশ দিলেন, 'ওরস্ক দেখাও।' তার মনে পড়ল, উরালের সর্ব দক্ষিণ প্রান্ত ওটা।

'ব্যাপার কি, এয়ার মার্শাল?' শান্ত সুরে জানতে চাইলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি।

ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে এমনভাবে তাকালেন ঝনঝেনিৎসিন, যেন তাঁর উপস্থিতি এইমাত্র টের পেলেন তিনি। 'বলছি, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি।' অপারেটরের দিকে ফিরলেন তিনি। 'এই রিপোর্টের কনফারমেশন এনে দাও—জলদি! পড়ে শোনাবে আমাকে।' টেবিলের গায়ে ফুটে থাকা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। উরালের দক্ষিণ প্রান্তে বিস্তৃত পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন, উপলব্ধি করলেন এই ছোট আকারে উরাল-কে দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। মুখ তুলে নির্দেশ দিলেন, 'উরালের প্রজেকশন দাও। উত্তর আর দক্ষিণ যত বেশি সম্ভব দেখতে চাই।' টেবিলের গায়ে ম্যাপ বদল হলো। টেবিলের মাঝখানে দগদগে একটা ক্ষতের মত দেখাল উরালকে। দক্ষিণ দিকে ধূসর রঙের বিস্তৃত ইরান, উত্তরে নীল ব্যারেন্ট সী আর আর্কটিক ওশেন।

চোখে কৌতুক এবং কৌতূহল, বসার ভঙ্গিতে ধৈর্য আর শিথিল ভাব নিয়ে এয়ার মার্শালের দিকে তাকিয়ে আছেন ফার্স্ট

সেক্রেটারি।

ম্যাপের ওপর একটা আঙুল রাখলেন ঝনঝেনিৎসিন। ম্যাপ ছুঁয়ে সেটা দক্ষিণে চলে এল, মধ্যপ্রাচ্য আর ভূমধ্যসাগরের দিকে। তারপর, আগের চেয়ে ধীর গতিতে, দু'এক জায়গায় অকস্মাৎ থেমে, চলে এল উত্তরে, উরাল পর্বতমালার ওপর। নোভাইয়া জেমলাইয়ার ওপর আঙুলটা একবার থামল, তারপর আরও উত্তরে সরে গিয়ে উত্তর-পশ্চিমে একটা বাঁক নিয়ে আর্কটিক ওশনে চলে এল।

আবার যখন মুখ তুললেন তিনি, শুনতে পেলেন অপারেটর বলছে, 'কনফারমেশন রিপোর্ট, এয়ার মার্শাল। আমাদের মোবাইল ইউনিট থেকে পরিচয় জানতে চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু পাইলট সাড়া দেয়নি। উত্তর-পুব দিকে গেছে ওটা, পার্বত্য এলাকার ভেতর দিকে। মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে আওয়াজটা মিলিয়ে যায়। তবে হেডিং আর স্পীড সম্পর্কে ওরা কনফার্মড।'

পিটি ডাভের এটা প্রথম ভুল, ঝনঝেনিৎসিন উপলব্ধি করলেন। এই ভুলের জন্যে অনেক বড় ক্ষতি স্বীকার করতে হতে পারে তাকে। পরিচয় দিতে চায়নি...যাচ্ছে উত্তর-পুব-দিকে...মাক টু-র চেয়েও দ্রুত-গতিতে—এসব থেকে একটাই সত্য বেরিয়ে আসে, আড়াল খুঁজছে পাইলট। এই স্পীডে ছুটতে হবে তাকে, লোকটা বোধহয় প্রথমে তা ভাবেনি—ফলে যেমন আশা করেছিল তারচেয়ে অনেক আগেই শেষ হয়ে যাবে তার ফুয়েল। আবার ম্যাপের দিকে তাকালেন এয়ার মার্শাল। উপলব্ধি করলেন, পিটি ডাভ আসলে মানুষের চোখ আর সাউন্ড ডিটেকশন এড়াবার জন্যে উরালের পুব দিকটা বেছে নিয়েছে। আর এর একটাই অর্থ হতে পারে...উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল এয়ার মার্শালের—রাশিয়ার উত্তরে কোথাও রয়েছে তার রিফুয়েলিং পয়েন্ট। হয়তো ব্যারেন্ট-সী-তে, নয়তো আরও ওপর দিকে

কোথাও। মুখ তুলে তিনি ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে তাকালেন।

'বলুন?' আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি।

'আপনি যদি ম্যাপের দিকে তাকান, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি,' ঝনঝেনিৎসিন অনুরোধ করলেন, 'আমি তাহলে ব্যাখ্যা করে বলার চেষ্টা করি।' সবাই ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, নিস্প্রভ আর ভোঁতা চেহারার কে.জি.বি. চীফও বাদ গেলেন না। ঝনঝেনিৎসিন পিটি ডাভ ওরফে রানার সম্ভাব্য কোর্স ম্যাপের গায়ে আঙুল টেনে দেখালেন। তারপর বললেন, 'মিগ-৩১ রাডারে ধরা না পড়লেও, ওকে আমরা খুঁজে বের করতে পারব।'

ওঅর কমান্ড সেন্টারে নিস্তব্ধতা নেমে এল। বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করলেন যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল বাকুনিন। ভারী গলায় জানতে চাইলেন, 'কিভাবে?'

ইনফ্রা-রেড উইপনস এইমিং সিস্টেম-কে কিভাবে ডাইরেকশনাল সার্চ বীম হিসেবে ব্যবহার করা যায় সেটা যতটা সহজে সম্ভব ব্যাখ্যা করে বললেন এয়ার মার্শাল। আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে জেনারেল বাকুনিন তাঁর পিঠ চাপড়ে দিলেন, আর ফার্স্ট সেক্রেটারি স্বভাবসুলভ স্মিত একটু হাসলেন। তবে তিনি জানতে চাইলেন, 'সব প্রস্তুত তো, নাকি মেকানিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্টের দরকার হবে?'

'কিছুরই দরকার নেই, আপনি অনুমতি দিলে আমি শুধু একটা কোড করা মেসেজ পাঠাব, তাহলেই হবে।'

'আর কি করতে চান আপনি?'

'রেড ব্যানার নর্দার্ন ফ্লিট-কে সতর্ক করে দেব আমি,' ঝনঝেনিৎসিন বললেন। 'ওরা খুঁজবে একটা সারফেস অথবা সাব-সারফেস...' চিন্তায় পড়ে গিয়ে থামলেন তিনি। না, ভাবলেন, ওদিকে বরফ, কাজেই রিফুয়েলিং পয়েন্ট হিসেবে ওরা সাবমেরিন ব্যবহার করতে পারবে বলে মনে হয় না। বরফের

ফাঁক গলে কোন জাহাজ...তারও সম্ভাবনা কম। 'সম্ভবত একটা প্লেনকে খুঁজে পাবে আমাদের লোকেরা, মিগ-৩১-কে আকাশ থেকেই ফুয়েল সাপ্লাই দেবে।' ফার্স্ট সেক্রেটারি মাথা ঝাঁকালেন। 'কাজেই এই মুহূর্তে আমাদের উচিত উত্তর উপকূল এলাকার মৌমাছি স্কোয়াড্রনগুলোকে সতর্ক করে দেয়া, মাদারপ্লেনটাকে খুঁজে বের করুক ওরা। আর, প্রথম শিখা-মালা মিসাইল ঘাঁটিগুলোকে পিটি ডাভকে খুঁজে বের করতে বলা হোক।'

আচমকা ম্যাপের গায়ে আঙুলের খোঁচা দিলেন ঝনঝেনিৎসিন। 'এখানে! ঠিক এখানে! পাইলট যদি উরাল ধরে আমেরিকানদের সর্ব উত্তর বিন্দুতে পৌঁছুতে চায়, আমাল পেনিনসুলার পশ্চিম দিকটা ব্যবহার করতে হবে তাকে। ভিজুয়্যাল সাইটিঙের জন্যে এই দু'জায়গার একটার ওপর দিয়ে যেতে হবে, তারপর সে তার মাদার এয়ারক্রাফটের জন্যে কোর্স বদল করবে।'

থেমে খানিক চিন্তা করলেন ঝনঝেনিৎসিন, তারপর আবার বললেন, 'দেখতেই পাচ্ছেন, প্রথম শিখা-মালার দুটো ইউনিট ফিক্সড রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে। ওগুলোর মাঝখানে রয়েছে মোবাইল ইউনিট, সেগুলোও রেঞ্জের বাইরে নয়। তাছাড়া, আমাদের মৌমাছি স্কোয়াড্রনগুলোও রয়েছে পেনিনসুলায়।' মুখ তুলে তাকালেন তিনি, মৃদু হাসলেন। 'প্রস্তুতি নিতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি, তারপর বিদেশী পাইলট বেচারা ইলেকট্রনিকস, ইনফ্রা-রেড, কামান, মিসাইল আর রকেটের তৈরি নিশ্ছিদ্র একটা ফাঁদের মধ্যে এসে ধরা দেবে। এখন, আপনার অনুমতি পাব কি...'

'কিসের অনুমতি, এয়ার মার্শাল?'

'আমাদের কোন বিমান যদি মিগ-৩১-কে দেখতে পায়, ওটাকে গুলি করার নির্দেশ দিতে পারব? মানে, যদি প্রয়োজন

দেখা দেয়?’

যুদ্ধমন্ত্রী মাঝপথে নিঃশ্বাস আটকালেন, শব্দটা ওরা সবাই শুনতে পেল।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। ‘হ্যাঁ, পারবেন। তাতে যদি আমাদের একটা বিমান হারাতে হয়, তবু।’

‘ধন্যবাদ, ফার্স্ট সেক্রেটারি,’ উল্লাস চেপে রেখে বললেন ঝনঝেনিৎসিন। ‘তাহলে ধরে নিন, পিটি ডাভ মারা গেছে।’

উরালের ওপর দিয়ে যেতে দু’ঘণ্টা সময় লেগে গেল রানার। ওরস্ক থেকে ভর্কুতা ষোলোশো মাইল, এই ষোলোশো মাইল পাড়ি দেয়ার সময় ছয়শো নটের বেশি স্পীড তোলেনি ও। ফুয়েল বাঁচাবার জন্যে স্পীড সাব-সোনিক পর্যায়ে রাখতে বাধ্য হয়েছে। ওর যাত্রাপথের নিচে জনবসতি আছে, কিন্তু দূরে দূরে ছড়ানো ছিটানো, গতি কম থাকায় সুপারসোনিক ফুটপ্রিন্ট কারও চোখে পড়ার ভয় নেই। নিচু পাহাড়ের মাথা ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে ও, মাথাগুলো কুয়াশায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। মাটি বা আকাশ থেকে সহজে কারও চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

উরাল পর্বতমালায় সামরিক স্থাপনা কি আছে না আছে সে-সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই রানার। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ওকে ধারণা দিয়েছিলেন, পর্বতমালার পুব ঢাল-এ সামরিক স্থাপনা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। পার্বত্য এলাকার ওপর দিয়ে যাত্রা শুরু করার পর ই-সি-এম ইন্সট্রুমেন্টে রাশিয়ানদের রাডার তৎপরতা কিছুই ধরা পড়েনি। এইমাত্র ন’টা বেজেছে, ওর চারপাশে হালকা হতে শুরু করেছে কুয়াশা, একটু একটু করে সকাল বেলার নীল আকাশ ফুটে উঠছে সামনে। ওর বর্তমান কোর্সে, জানে, গালফ অফ কারা-র ওপর দিয়ে উড়ে যাবে

ও।

সামনে খুব বেশি দূর দেখা যায় না এখনও। পানির কোন চিহ্ন নেই, সবটাই ঝাপসা, দিগন্তরেখাও দেখা যায় না। অথচ যতটা সম্ভব নিচে নেমে যেতে হবে ওকে। আর এরচেয়ে বেশি নিচে নামলে মাটি থেকে কারও চোখে পড়ার ঝুঁকি থাকবে। উত্তর উপকূলে রাশিয়ানদের রয়েছে শিখা-মালা মিসাইল ঘাঁটি, সেগুলোর ইনফ্রা-রেডেও ধরা পড়ার ভয় আছে।

খানিক নিচে নামতেই পর্বতমালার শেষ ঢেউগুলো দেখতে পেল রানা, ক্রমশ সাগরের দিকে নেমে গেছে। এখনও কোথাও কোথাও জমাট বেঁধে আছে কুয়াশা, সূর্যের আলো সেগুলোকে ভেদ করতে পারেনি, কুয়াশার এই পকেটগুলোর আড়ালে থাকল মিগ-৩১। পোর্ট সাইডে খুদে শহর ভর্কুতা দেখা গেল। বুঝল, দিক নির্ণয়ে ভুল হয়নি। আর কয়েক মিনিট পরই সাগরের দেখা মিলবে।

হঠাৎ চমকে উঠল রানা। রাডার স্ক্রীনের এক কোণে, ওপর দিকে আর স্টারবোর্ড সাইডে, একটা প্লেন। বেশ বড়ই হবে, সম্ভবত একটা ব্যাজার লং রেঞ্জ রিকনিস্যান্স্ প্লেন, কারাসী আর আর্কটিক ওশেন থেকে রুটিন পেট্রল শেষ করে ফিরছে।

কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। দ্রুত কাছে চলে আসছে ব্যাজার। ওর ধারণা, প্লেনটার অনেক পিছন দিয়ে পাশ কাটাতে পারবে ও। মনে মনে আশা করল, ব্যাজারের ইলেকট্রনিক ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট নিশ্চই অফ করে রাখা হয়েছে, হোমবেসের এত কাছাকাছি এসে তাই রাখার কথা। তারপর, চোখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস নিয়ে দেখল, রাডার স্ক্রীনে কমলা রঙের তিনটে ফোঁটা, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে, সেই সাথে ওপরে উঠছে আর কাছে চলে আসছে। একটা ইনফ্রা-রেড সোর্স। শিখা-মালা স্টেশন থেকে রাশিয়ানরা মিসাইলের একটা ব্র্যাকেট

তুলে দিয়েছে আকাশে।

ওরা জানে ও কোথায়। অবিশ্বাসে একটা ধাক্কা লাগল। উপলব্ধি করল, রাডারকে ফাঁকি দিতে পারাই যথেষ্ট নয়। ইনফ্রা-রেডের কথা মনে ছিল, কিন্তু হঠাৎ এভাবে মূর্তিমান বিপদ হয়ে দেখা দেবে, ভাবতে পারেনি। এই মিসাইলগুলো সম্পর্কে জানে ও। আকাশের সবচেয়ে উত্তপ্ত অংশের পিছু নেবে। তাপ-উৎস সন্ধানী মিসাইল। যেভাবেই হোক, ওকে ওরা দেখতে পেয়েছে। মিগ-৩১-এর এগজস্ট গ্যাস খুঁজে নিয়েছে শিখা-মালার ইনফ্রা-রেড ইকুইপমেন্ট। রাডারে ওকে দেখা যাচ্ছে, ইনফ্রা-রেড স্ক্রীনে। কমলা রঙের একটা জ্বলজ্বলে ফোঁটা।

বাড়তি সুবিধেটুকু এখন আর নেই। টার্গেট দেখতে পেয়েছে ওরা, মিসাইলও ছুঁড়ে দিয়েছে। ভেতর থেকে চ্যালেঞ্জ এল, দেখি তো কিভাবে প্রাণে বাঁচো, মাসুদ রানা!

মিসাইলগুলো দ্রুত এয়ারকিঙের কাছে চলে আসছে। রাডার স্ক্রীনে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ফোঁটাগুলো।

রানার চোখ দুটো স্থির।

চার

আর সাত সেকেন্ড পর সংঘর্ষ।

কমলা রঙের ফোঁটা তিনটে থেকে চোখ সরিয়ে নিল রানা। রাডার স্ক্রীনে আরও একটা সবুজ ব্লিপ দেখা যাচ্ছে, ব্যাজারের অস্তিত্ব প্রকাশ করছে ওটা। আর মাত্র কয়েক মাইল দূরে রিকনিস্যান্স্ প্লেনটা, ওর নিচের দিকে, দ্রুত একপাশে সরে যাচ্ছে। একই স্ক্রীনে মিগ-৩১-এর ইলেকট্রনিক চোখ রয়েছে,

ইনফ্রা-রেড-এর অস্তিত্ব ধরা পড়বে কমলা রঙের ফোঁটা হয়ে, রাডার স্ক্রীন হিসেবেও কাজ করবে এটা, ব্লিপ ধরা পড়বে সবুজ রঙের ফোঁটা হয়ে। ওর পিছনে রয়েছে মিসাইল তিনটে, স্ক্রীনের মধ্যরেখার নিচের অংশে। মিগ-৩১ এখনও ব্যাজারের দিকেই ছুটছে, ব্যাজার রয়েছে স্ক্রীনের সেন্ট্রাল রেঞ্জিং বার-এর ওপর।

ব্যাজারই ওর নিরাপত্তার চাবি, উপলব্ধি করেছে রানা। মিসাইলগুলোকে বিপথে যেতে সাহায্য করবে ও। আকাশে ওর ইঞ্জিনের চেয়ে বেশি গরম একটা কিছু সৃষ্টি করতে পারলেই মিসাইলগুলো সেদিকে ছুটবে। ব্যাজারকে ধ্বংস না করে উপায় নেই কোন, নিজেকে তো বাঁচতে হবে।

কোর্স একটু বদলাল রানা, সরাসরি ছুটল মিগ-৩১, যেন ধাক্কা দেবে ব্যাজারকে। স্ক্রীনের মাঝখানে সরে আসছে কমলা ফোঁটা, কিন্তু ওগুলোর কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল রানা।

আর পাঁচ সেকেন্ড পর সংঘর্ষ।

থ্রটল আরও খুলে দিল রানা। নিজের একটা মিসাইল রিলিজ করার আগে ব্যাজারের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছুতে হবে ওকে। শরীরের চারদিকে অ্যান্টি-জি স্যুট আঁট হয়ে চেপে বসল, তারপরই ঢিল দিল। কমলা রঙের তিনটে ফোঁটা পিছিয়ে পড়ল মুহূর্তের জন্যে, পরক্ষণে আবার তাদেরকে দেখা গেল স্ক্রীনের মাঝখানে, অর্থাৎ পিছু ছাড়ছে না। সবুজ ফোঁটাটা বড় হতে শুরু করল। বাঁ দিকে হাত বাড়িয়ে কনসোলের গায়ে ফিট করা উইপন আর্মিং বোতাম টিপে দিল রানা। এরপর দ্রুতহাতে কয়েকটা বোতামে চাপ দিয়ে চালু করে দিল থট-ট্রিগার আর গাইডেন্স-সিস্টেম। অসাবধানে যাতে উইপনস-সিস্টেম চালু না হয়ে যায়, সেজন্যেই এই বোতামের ব্যবস্থা। মিসাইল আর টার্গেট চোখে দেখে নিজের মিসাইল গাইড করতে পারে রানা, আবার স্ক্রীনে ওগুলোকে দেখেও তা পারে। চোখে ও যা দেখবে, দেখার পর

মিসাইলকে দিয়ে যা করাতে চাইবে, ব্রেনের ভেতর সেই দেখা আর ইচ্ছেটা ইলেকট্রিক্যাল ইমপালসে পরিণত হবে, ইমপালস্ ডিটেক্ট করবে ওর হেলমেটে বসানো ইলেকট্রোড, ওখান থেকে সঙ্কেতগুলো পৌঁছে যাবে উইপনস্-সিস্টেমে, উইপন্স-সিস্টেম একটা স্টিয়ারিং সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করবে মিসাইলে। ডিসট্যান্স-টু-টার্গেট রিড আউট যেই মাত্র ইঙ্গিত দেবে আঘাত হানার এটাই আদর্শ মুহূর্ত, সেই মুহূর্তে থট-গাইডেড সিস্টেম উইং-এর তলা থেকে একটা মিসাইল ছুঁড়বে।

নিজের ব্র্যাকেট থেকে বেরিয়ে এল মিসাইলটা, তারপর এয়ারকিঙের ফেলে আসা পথ থেকে ওপরে আর একপাশে সরে গেল। মুহূর্তের জন্যে আলোর একটা ঝলক দেখতে পেল রানা, মিসাইলের মটর চালু হয়ে গেছে।

আর তিন সেকেন্ড পর সংঘর্ষ।

আশা আর উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা দুলছে। ব্যাজারের আউটলাইন পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, ওর নাক বরাবর সোজা, আকারে দ্রুত বড় হচ্ছে। ডান দিকে অকস্মাৎ বাঁক নিল, ব্যাজারের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু যতটা সম্ভব ওটার গা ঘেঁষে যেতে চাইছে ও। আর মাত্র দু'সেকেন্ড। স্ক্রীনে কমলা রঙের ফোঁটাগুলো সবুজ ফোঁটার সাথে এই মিলল বলে।

স্ক্রীনের ঠিক মাঝখানে ব্যাজার। মনে হলো ওটা একটা ফুলের কুঁড়ি, পাপড়ি মেলে ফুলের আকৃতি নিচ্ছে। তার সবুজ রঙ অদৃশ্য হয়েছে, এয়ারকিঙের মিসাইল ওটার গায়ে লেগে বিস্ফোরিত হওয়ায় স্ক্রীনে এখন ওটা কমলা রঙ পেয়েছে—আকাশে এখন ওই জায়গাটাই সবচেয়ে উত্তপ্ত।

জিরো সেকেন্ড।

আরও, আরও বড় হলো ফুলটা, তিনটে মিসাইল সদ্য বিধ্বস্ত ব্যাজারের গায়ে লেগে একই সাথে বিস্ফোরিত হয়েছে। শব্দ,

আগুন আর ধোঁয়া পিছনে রেখে ছুটে পালাচ্ছে মিগ-৩১, রাডার স্ক্রীনের মধ্যরেখার একটু নিচে এখনও পাপড়ি মেলছে কমলা রঙের ফুল। হঠাৎ খেয়াল করল ও, প্রেশার স্যুটের ভেতর দরদর করে ঘামছে ও। স্বস্তির পরম একটা শীতল পরশ দেহ মন জুড়িয়ে দিল। মাটি থেকে যারা ইনফ্রা-রেড ব্যবহার করে ওকে আবিষ্কার করে ফেলেছিল, এই ঘটনার পর তারা বিভ্রান্ত হবে। ওদের ইনফ্রা-রেড স্ক্রীনে সংঘর্ষের বিশাল ব্লিপ ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছুই ধরা পড়বে না। ব্যাজার আকাশ থেকে মাটিতে পড়বে, আগুনও নিভবে, কিন্তু ততক্ষণে রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে মিগ-৩১। রানা আশা করল, ওরা ধরে নেবে, বিস্ফোরণের ফলে মিগ-৩১-ও ভস্ম হয়ে গেছে।

স্পীড চেক করল রানা। ঘণ্টায় সাতশো মাইলের একটু নিচে। উপকূলের কাছে চলে আসছে, কাজেই গতি সুপারসোনিকে তুলতে পারে না। ট্রেনিং পাওয়া কান নিয়ে নিচে অপেক্ষা করছে লোকজন।

এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছে, তাই কোইভিসতুকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। থট-গাইডেড উইপনস-সিস্টেম কোইভিসতুর প্রজেক্ট, প্রমাণ হয়ে গেল সিস্টেমটা নিখুঁতভাবে কাজ করে। গোটা ব্যাপারটা প্রায় চোখের পলকে ঘটে গেল, কিন্তু এই অল্প সময়েও একটা সুনির্দিষ্ট ছক বাঁধা নিয়মের ভেতর দিয়ে আসতে হয়েছে ওকে। চিন্তার মত দ্রুত গতিতে রিয়্যাক্ট করতে বা সাড়া দিতে হয়নি ওকে, তার কোন দরকার ছিল না। তবে সচেতনভাবে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে। পোর্ট উইংটিপ মিসাইল সম্পর্কে ওর সিদ্ধান্ত দৃঢ় আর গোছাল হবার সাথে সাথে এ.এ.এম-এর অ্যানাব-টাইপ মিসাইল ফায়ার হয়েছে। মিসাইল বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় শুধু একটা ঝাঁকি অনুভব করেছিল ও, আর কিছু না।

চোখ বুলিয়ে-টি-এফ আর দেখল রানা। উপকূলের নিচু এলাকা পেরোচ্ছে মিগ-৩১। ওর চারপাশে সী-ফগ–হালকা, মনে হচ্ছে এই বুঝি ছড়িয়ে পড়ে মিলিয়ে যাবে, তবে আড়াল হিসেবে কাজ চলে। সবচেয়ে বড় কথা, এই সী-ফগ সাউন্ড মাফলার হিসেবেও কাজ করছে, এয়ারকিঙের আওয়াজ ভোঁতা আর বিকৃত শোনাবে রাশিয়ানদের সাউন্ড ডিটেকটিং ইকুইপমেন্টে। ইঞ্জিনের আওয়াজও প্রতিধ্বনিত হবে।

টি-এফ-আর স্ক্রীনে উপকূল ধরা পড়ল। সাগরের সরু গলা ভুখণ্ডের অনেকটা দূর পর্যন্ত ঢুকে এসেছে। গালফ অভ কারা। পানির ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় এয়ারকিঙের নাক আরও একবার নিচু হলো। কখনও হালকা, কখনও গাঢ় সী-ফগ কেবিনের পাশ দিয়ে তুষার ঝড়ের মত সরে যাচ্ছে। যেদিকে যেতে চায় রানা, রিড-আউটে সেদিকটাই দেখা যাচ্ছে। নোভাইয়া জেমলাইয়ার জোড়া দ্বীপের দিকে ছুটল মিগ-৩১, বর্তমান পজিশন থেকে উত্তর পশ্চিমে।

প্রতি ঘণ্টায় দুশো পঞ্চাশ মাইল স্পীড। ট্র্যানজিসটর রেডিওর পিছনের খুদে ঢাকনি, যেটা ব্লিপার হিসেবে কাজ করেছিল, দেখতে ছোট সার্কিট-বোর্ডের মত, কন্ট্রোল প্যানেলের এক কোণে সাঁটা রয়েছে। ওটার দিকে একবার তাকাল রানা। এটা এখন হোমার পিক-আপ হিসেবে কাজ করবে। দেখতে ছোট হলে হবে কি, অত্যন্ত জটিল মেকানিজমের সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে জিনিসটা। সেট করা একটা ফ্রিকোয়েন্সি প্যাটার্ন আছে, সেই একই প্যাটার্ন থেকে ট্র্যান্সমিট করা বীকন ধরার চেষ্টা করবে ওটা। সিগন্যালটা মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হবে, রানা ছাড়া আর কারও কানে গেলে দুর্বোধ্য স্ট্যাটিক আওয়াজ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারবে না সে। সুইচ অন করা থাকলে ঠিক কোন্ পয়েন্টে সিকোয়েন্সে প্রবেশ করবে প্লেন হোমার পিক-আপ তা

জানতে পারবে। খুদে বোতামটা টিপে দিয়ে পিক-আপ চালু করল রানা।

পরিচিত সিগন্যাল এল না।

রিফুয়েলিং পয়েন্ট থেকে ট্র্যান্সমিট করা সিগন্যাল না পেলে, এয়ারকিং নিয়ে আর্কটিক ওশেনে চিরতরে হারিয়ে যাবে রানা। ফুয়েল শেষ হবে, সেই সাথে পৈত্রিক প্রাণটাও।

'জননী'-র কথা কিছুই জানানো হয়নি পিটি ডাভকে, কাজেই রানাও জানে না। পাইলট ধরা পড়ে গেলে তার কাছ থেকে সমস্ত তথ্য আদায় করা হবে, সেজন্যেই সি.আই.এ-এর এই সাবধানতা। তারা চায়নি তাদের 'জননী' রাশিয়ানদের হাতে ধরা পড়ার কোন সুযোগ থাকুক।

ফুয়েল গজের দিকে তাকাল রানা। চার ভাগের এক ভাগ ফুয়েলও অবশিষ্ট নেই। আর কত দূর যেতে হবে, জানে না। সিগন্যাল পেলে বুঝবে রিফুয়েলিং পয়েন্ট থেকে মাত্র তিনশো মাইল দূরে রয়েছে ও।

অটো পাইলটের হাতে প্লেন ছেড়ে দিল ও, বোতাম টিপে টি-এফ-আর চালু করে দিল। অভিযানের দুরূহতম যাত্রা শুরু হতে যাচ্ছে,ল্লায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়বে। এটা স্রেফ আসলে ভাগ্য পরীক্ষা, কারণ আগে কখনও এই হোমার পিক-আপ ব্যবহার করা হয়নি। ওটা যদি কাজ না করে, রানার কোন আশা নেই।

নিচে বরফ আর নদী, ফ্যাকাসে আর একঘেয়ে। খালি চোখে কোথাও একটা জলযানের দেখা নেই, রাডারও ফাঁকা। আবার একবার ফুয়েল গজের দিকে তাকাল ও। রিফুয়েলিং পয়েন্ট নিশ্চয়ই রুশ সীমান্ত থেকে কয়েকশো মাইল দূরে হবে, কারণ নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। তেল ফুরিয়ে আসছে।

কোন সিগন্যাল এল না।

'ব্যারেন্ট সী-র ম্যাপ দাও,' আদেশ করলেন এয়ার মার্শাল ঝনঝেনিৎসিন। 'ট্রলার, এলিন্ট ভেসেলসহ ন্যাভাল গতিবিধি দেখতে চাই।' ডিম্বাকৃতি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, চিন্তিতভাবে দু'আঙুল দিয়ে চিবুক টানছেন।

টেবিল থেকে রাশিয়ার উত্তর উপকূল প্রজেকশন অদৃশ্য হয়ে গেল, বদলে ফুটে উঠল ব্যারেন্ট-সী।

অনেকক্ষণ ধরে ম্যাপটা দেখলেন ঝনঝেনিৎসিন। 'প্রিন্ট-আউট কোথায়?' জানতে চাইলেন তিনি। কমপিউটর-কনসোল থেকে উঠে এসে তাঁর হাতে একটা ছাপা কাগজ ধরিয়ে দিল অপারেটর। প্রজেকশন আলোকিত যে-সব ফোঁটা রয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরিচয় আর সর্বশেষ অবস্থান উল্লেখ করা আছে এই প্রিন্ট-আউটে। বারবার ম্যাপে চোখ ফেলে কাগজটা পরীক্ষা করলেন এয়ার মার্শাল।

কলুয়েভ-এর উত্তরে আর নোভাইয়া জেমলাইয়ার পশ্চিমে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে অনেকগুলো সাদা ফোঁটা, ওগুলো ট্রলার। একটু দূরে রয়েছে গাঢ় নীল রঙের একজোড়া ফোঁটা, এলিন্ট ভেসেল অর্থাৎ স্পাই ট্রলার। স্পাই ট্রলারগুলোয় রয়েছে এরিয়াল, সারফেস আর সাব-সারফেস ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট। এই মুহূর্তে ট্রলার দুটো তাদের ইনফ্রা-রেড ডিটেকটরের সাহায্যে আকাশে মিগ-৩১-কে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

প্রজেকশনের উত্তর দিকে তাকালেন এয়ার মার্শাল। ওখানে একটা ন্যাভাল ভেসেল রয়েছে, লাল রঙের ফোঁটা। হাতের তালিকা দেখে বুঝলেন, ওটা একটা মস্কোভা শ্রেণীর হেলিকপ্টার এবং মিসাইল ক্রুজার, রিগা—রেড ব্যানার নর্দার্ন ফ্লিট-এর গর্ব। আঠারো হাজার টন পানির জায়গা দখল করে ভাসছে ওটা, সাথে রয়েছে দুটো সারফেস টু-এয়ার মিসাইল লঞ্চার আর দুটো সারফেস অথবা অ্যান্টি সাবমেরিন লঞ্চার সহ চারটে সিক্সটি-

মিলিমিটার গান, মর্টার, চারটে টর্পেডো টিউব আর চারটে হান্টার-কিলার হেলিকপ্টার। এই মুহূর্তে পুব দিকে যাচ্ছে ওটা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নোভাইয়া জেমলাইয়ার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।

ম্যাপের আরেক জায়গায় দুটো মিসাইল-ডেস্ট্রয়ার দেখলেন এয়ার মার্শাল। একটা নোভাইয়া জেমলাইয়ার প্রায় উত্তরে, চিরস্থায়ী বরফের চাদরে ঢাকা ফ্র্যাঞ্জ যোশেফ ল্যান্ডের কাছাকাছি। অপরটা দক্ষিণ আর পুব দিকে যাচ্ছে, স্পিটবারজেনের দিক থেকে। রেড ব্যানার ফ্লিটের বেশিরভাগ সারফেস ভেসেল রয়েছে ক্রনস্টাড-এ, ওটা নেভার মোহনায় বিশাল একটা আইল্যান্ড বেস, লেনিনগ্রাদের কাছাকাছি।

ম্যাপের গায়ে বেশ কয়েকটা হলুদ ফোঁটা দেখে স্বস্তি বোধ করলেন ঝনঝেনিৎসিন। ওগুলো সোভিয়েত সাবমেরিন। তালিকা দেখে কোন্‌টা কি টাইপের জেনে নিলেন তিনি, কোন্‌টায় কি ধরনের অস্ত্রপাতি আছে আর কোন্‌টার অনুসন্ধান ক্ষমতা কতটুকু এক এক করে স্মরণ করলেন।

আপাতত তিনটে আণবিক শক্তিচালিত ভি টাইপ আর দুটো ব্যালেস্টিক-মিসাইল অ্যান্টি-সাবমেরিন সাব-এর প্রতি মনোযোগ দিলেন না। ক্রনস্টাড থেকে রুটিন স্ট্রাইক-পেট্রল সেরে ফিরছে ওগুলো, তাঁর কোন কাজে লাগবে না। তাঁর আসলে দরকার প্লেন খুঁজে বের করতে এবং বের করার পর সেটাকে ধ্বংস করতে পারে এমন সাবমেরিন।

'বিধ্বস্ত প্লেন সম্পর্কে কোন রিপোর্ট এল?' জানতে চাইলেন তিনি।

'বিশদ কিছু এখনও আসেনি, এয়ার মার্শাল,' অপারেটর জানাল। 'সার্চ পার্টি এখনও সাইটে পৌঁছায়নি। ওপর দিয়ে আমাদের সার্চ প্লেন উড়ে যাবার সময় যা দেখেছে—ব্যাজার ছাড়া

আর কিছু বিধ্বস্ত হয়নি বলেই মনে হয়।'

'রিফুয়েলিং পয়েন্ট সম্পর্কে কোন রিপোর্ট থাকলে বলো।'

কয়েক সেকেন্ড পর অপর একজন অপারেটর বলল, 'নেগেটিভ, এয়ার মার্শাল।' মিগ-৩১-এর রেঞ্জের মধ্যে অচেনা কোন সারফেস ভেসেল বা প্লেন নেই।

চেহারায় রাগ আর দিশেহারা ভাব নিয়ে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ঝনঝেনিৎসিন। রিফুয়েলিং পয়েন্ট থাকতেই হবে, তা না হলে মিগ-৩১-নিয়ে মারা পড়বে পিটি ডাভ। 'কোথায় ওটা?'

ফার্স্ট সেক্রেটারি নড়েচড়ে বসলেন। এয়ার মার্শালের অস্থিরতা লক্ষ করে তিনি গম্ভীর।

'আরও পশ্চিম থেকে কোন রিপোর্ট নেই?' জানতে চাইলেন এয়ার মার্শাল। 'শিখা-মালা বা কোস্টাল পেট্রল-এর ইনফ্রা-রেড বা সাউন্ড-ডিটেক্টর থেকে?'

ওঅর কমান্ড সেন্টারে নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর একজন অপারেটরের মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'নেগেটিভ, এয়ার মার্শাল। শুধু আমাদের স্কোয়াড্রনগুলো ছাড়া আর কিছু নেই ওদিকে।'

ম্যাপে চোখ রেখে গ্রীনল্যান্ড আর বিয়ার আইল্যান্ড দেখলেন এয়ার মার্শাল। উঁহুঁ, মিগ-৩১ অত দূরে যেতে পারবে না, তার আগেই ফুয়েল শেষ হয়ে যাবে। ওদিকে একটা ব্রিটিশ ট্রলার ফ্লিট রয়েছে বটে, কিন্তু ওই ফ্লিটের পক্ষে একটা মিগ-কে আশ্রয় দেয়া সম্ভব নয়।

না, ম্যাপে আসলে উত্তর নেই। 'কোথায় সে?' আবার তিনি বিড়বিড় করে বললেন।

অনেকক্ষণ পর এবার মুখ খুললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, 'আপনার নিশ্চিত বিশ্বাস সে বেঁচে আছে?'

মুখ তুলে তাকালেন ঝনঝেনিৎসিন, মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ,

কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি। বেঁচে আছে লোকটা।'

ওই ওটা, ভাবলেন সি.আই.এ. চীফ রবার্ট মরগ্যান, 'জননী-১'। বিশাল ওয়াল ম্যাপে নিঃসঙ্গ একটা কমলা রঙের বিন্দু। নিরস্ত্র একটা সাবমেরিন, ভাসমান বরফের তলায় গা ঢাকা দিয়ে পুব দিকে এগিয়ে চলেছে।

খাবার ভরা দুটো ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল লিলিয়ান আর আইলিন।

একটা টেবিলে বসলেন সবাই। খেতে শুরু করে জর্জ হ্যামিলটন সি.আই.এ. এজেন্ট (প্রাক্তন নেভী অফিসার) টলব্যাটের দিকে ফিরলেন। জানতে চাইলেন, 'আমাদের ফুয়েল-ট্যাঙ্কারের ওপর বরফ রয়েছে, ওই বরফের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন দেখি।'

মুখ থেকে কাঁটা-চামচ নামিয়ে টলব্যাট বলল, 'বরফের গভীরতা আর সারফেস কন্ডিশন সম্পর্কে শেষ যে রিপোর্টটা পেয়েছি তাতে বলা যায় ল্যান্ডিং করতে কোন অসুবিধে নেই।'

'তুমি ঠিক জানো?' প্রশ্ন করলেন মরগ্যান।

'আপনি তো, স্যার, জানেনই, জননী-১ থেকে সিগন্যাল আসে সবচেয়ে কাছের স্থায়ী ওয়েদার স্টেশন হয়ে,' বলল টলব্যাট। 'কেউ যদি ওই সিগন্যাল ধরে, তার কাছে ওটা সাধারণ ওয়েদার রিপোর্ট বা আইস সাউন্ডিং বলে মনে হবে। কাজেই, সাবমেরিনে বসে হার্বার্ট জেমসন কি ভাবছে আমরা তা জানতে পারছি না, শুধু সিগন্যালে যা বলছে তাই জানতে পারছি। তবে, পরিস্থিতি ভাল মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।'

'কি রকম?'

'বরফের ওপরটা বদলায়নি, এখনও শক্ত আছে, তাই বাতাসের ধাক্কায় কোথাও গর্ত তৈরি হয়নি,' বলল টলব্যাট।

'তাছাড়া, আকারে ওটা এখনও ছোট হতে শুরু করেনি। আরও দক্ষিণে গিয়ে গলতে শুরু করবে, তাও তিন চার দিনের আগে নয়।'

'তুমি বলছ, যথেষ্ট পুরু ওটা?' বারবার প্রশ্ন করে নিশ্চিত হতে চাইছেন মরগ্যান।

'যথেষ্ট। লম্বা-চওড়ায়ও বিশাল—পিটি যদি আদৌ পাইলট হয়, প্লেন নিয়ে ল্যান্ড করতে তার কোন অসুবিধা হবে না।'

'আর আবহাওয়া?'

'এই মুহূর্তে চমৎকার আবহাওয়া রয়েছে ওখানে, স্যার।' কয়েক সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করল টলব্যাট, তারপর আবার বলল, 'এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, স্যার। বছরের এই সময়টা এত ভাল আবহাওয়া সাধারণত দেখা যায় না।'

'অস্বাভাবিক?'

'জ্বী, স্যার। তারমানেই, যে-কোন মুহূর্তে আবহাওয়া বদলে যেতে পারে ওখানে।'

'সাবমেরিন থেকে পাঠানো রিপোর্টে কি বলা হয়েছে, আবহাওয়ার ব্যাপারে?'

'চিন্তিত হবার মত কিছু নয়। আবহাওয়া ভাল। সাবমেরিনের সেইল থেকে খানিক পর পর বরফ ভেদ করে পানির ওপর তোলা হচ্ছে সেনসর।'

খাওয়ায় মন দিতে চেষ্টা করলেন মরগ্যান। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন, 'এটা কিন্তু এক ধরনের পাগলামি। গোটা অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলছি আমি।'

'কিন্তু এই পাগলামির প্রয়োজন ছিল,' জোর দিয়ে বললেন ময়নিহান।

'প্রেসিডেন্ট আমাদের প্ল্যান অনুমোদন করেছেন, এটা আমার জন্যে বিরাট একটা স্বস্তি,' মরগ্যান বললেন।

থামো, ভালয় ভালয় রানা বাংলাদেশে ফিরুক, তখন টের পাবে–ভাবলেন হ্যামিলটন।

টলব্যাট বলল, 'রিফুয়েলিং আমার দায়িত্ব, স্যার। এ-ব্যাপারে আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না, প্লীজ। বরফের ওপর প্লেনটাকে নামানো, সাবমেরিন থেকে ফুয়েল সাপ্লাই দেয়া, হ্যাঁ, ঝুঁকি আছে স্বীকার করি–কিন্তু সম্ভব।'

'যদি কোন বিপদ হয়...'

'এই মুহূর্তে ওদের চোখে সাবমেরিন ধরা পড়ছে না, কারণ বরফের নিচে রয়েছে ওটা,' টলব্যাট পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলল। 'সোনার স্ক্রীনে ওটা ধরা পড়ছে না। বরফের নিচ থেকে একবার উঠে এসে এয়ারকিঙের ট্যাংক ভরে দিয়ে আবার লুকাবে, কাকপক্ষীও টের পাবে না। আমি তো কোন বিপদ দেখছি না...'

হ্যামিলটন কফির কাপে চুমুক দিলেন। 'সাবমেরিনে যারা আছে তারা কেউ পিটি ডাভকে চেনে?'

'না। তার কোন দরকারও নেই।'

দরকার ছিল, তোমরা সেটা টের পাওনি, ভাবলেন হ্যামিলটন। মনে মনে স্বস্তি বোধ করলেন তিনি। মার্কিন সাবমেরিনের ক্রুরা রানার জন্যে কোন বিপদ হয়ে দেখা দেবে না।

নোভাইয়া জেমলাইয়ার জোড়া দ্বীপের দিকে ছুটছে মিগ-৩১। গতি ঘণ্টায় দুশো মাইলের কিছু বেশি।

অনেক আগে থেকেই কমতে শুরু করেছে কুয়াশা, তারপর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল। নিচে ধূসর রঙের ব্যারেন্ট সী, ঝাপসা, নীল আকাশের কোন ছাপ পড়েনি তার বুকে। কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসার পর মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড পেরিয়েছে, আচমকা প্রায় সরাসরি ওর নিচে এসে পড়ল ট্রলারটা। ডেকের

ওপর দিয়ে স্যাঁৎ করে উড়ে আসার সময় সাদা একটা মুখ দেখতে পেল রানা, ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। একশো ফিটেরও কম ওপর থেকে তাকে দেখল ও, হাতের বালতি উপুড় করে কি যেন ফেলছিল নদীতে। পলক ফেলার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রলার, শুধু রাডার স্ক্রীনে সবুজ একটা বিন্দু হয়ে থাকল। নিজের ওপর রাগ হলো রানার, উপকূল রেখা পেরোবার পর বোকার মত অফ করে রেখেছিল ফরওয়ার্ড-লুকিং রাডার। এখন আবার সেটা অন করল ও।

এক মুহূর্ত পর বিপদের আসল চেহারা ধরা পড়ল। ই.সি.এম. রিড-আউট থেকে জানা গেল ওর ঠিক পেছনে রাডার অ্যাকটিভিটি তুঙ্গে উঠেছে। একটা এলিন্ট শিপের ওপর দিয়ে উড়ে এসেছে ও—ওটা একটা স্পাই ট্রলার। ইনফ্রা-রেডের সাহায্যে ওরা তার যাত্রাপথ অনুসরণ করতে পারছে।

স্টিক সামনে ঠেলে দিল রানা, লাফ দিয়ে কাছে চলে এল সাগর। সাগরের পিঠ থেকে পঞ্চাশ ফিট ওপরে থামল মিগ-৩১। ভাগ্য বিরূপ না হলে ইলেকট্রনিক চোখের আড়ালে চলে এসেছে এয়ারকিং। এতটা নিচে ইনফ্রা-রেডও খুঁজে নিতে পারবে না। এলিন্ট শিপের অপারেটররা তাদের স্ক্রীন থেকে মিগ-৩১-কে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু তবু বিপদ কাটেনি, কারণ ওরা জেনে ফেলেছে কোন্ দিকে যাচ্ছে ও। মিগ-৩১ নোভাইয়া জেমলাইয়ার দিকে যাচ্ছে, এই খবরটা বিলিয়ারস্কে পৌঁছে যাবে।

ফুয়েল গজের দিকে তাকাল রানা। দ্রুত কমে আসছে ফুয়েল। কোন কারণে যদি রিফুয়েলিং পয়েন্ট খুঁজে পেতে দেরি হয়, বাঁচার কোন আশা নেই।

থ্রটলটা মুঠো করে ধরল রানা। নোভাইয়া জেমলাইয়ায় রুশ আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করা হত, এখন সেখানে মিসাইল ঘাঁটি বসানো হয়েছে। রাশিয়ান ডি.ই.ডব্লিউ. লাইন-এর সর্বউত্তর বিস্ত

ৃতিও ওদিকে, সাথে প্রথম শিখা-মালা সংযোগ। রানা জানে, সী-লেভেলে এয়ারকিং মাক টু পয়েন্ট সিক্স স্পীডে ছুটতে পারে। কিন্তু আসলে এর গতি কত রানা জানে না। ওকে বলা হয়েছে শেষ সীমা মাক ফাইভ, কিন্তু ওর ধারণা মাক সিক্সে তোলা যেতে পারে স্পীড। তার মানে, প্রতি ঘণ্টায় সাড়ে চার হাজার মাইলেরও বেশি আর সী-লেভেলে সম্ভবত দুই পয়েন্ট দুই হাজার মাইল।

পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী প্লেন।

থ্রটল খুলে দিল রানা। মহামূল্যবান ফুয়েল বেশি বেশি করে খরচ না করে এখন আর কোন উপায় নেই। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে ও। মাক কাউন্টার ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে—মাক ওয়ান পয়েন্ট থ্রী, ওয়ান পয়েন্ট ফোর, ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ...

লম্বাটে এক জোড়া দ্বীপ, মাঝখানে সরু একটা চ্যানেল। চ্যানেলের দক্ষিণ-পুব কোণে ম্যাটোচকিন শার মিসাইল ঘাঁটি। নোভাইয়া জেমলাইয়ায় পৌঁছে গেছে রানা। মিসাইল ঘাঁটি থেকে কেউ যদি ওকে দেখে থাকে, স্ক্রীনে শুধু আলোর একটা ঝলক ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি, তাও মাত্র পলকের জন্যে। তবে ঘাঁটি পেরিয়ে আসার পর ফেলে আসা পথে যে আওয়াজটা রেখে আসবে এয়ারকিং সেটা ওরা শুনতে পাবে।

সাগর থেকে দুশো ফিটেরও কম ওপরে রয়েছে রানা। প্লেনের দায়িত্ব রয়েছে টি-এফ-আর এবং অটো-পাইলটের ওপর। সরু চ্যানেলে যদি কোন জাহাজ থাকে, দেখার পর সময় পাবে না ও, এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হতে পারে সেটা, দিক বদলে সংঘর্ষ এড়াবার তখন আর কোন উপায় থাকবে না। সেজন্যেই টি-এফ-আর চালু করে দিয়েছে ও, কমপিউটর হয়তো শেষ মুহূর্তে এড়িয়ে যেতে পারে সংঘর্ষ। স্ক্রীনের দিকে

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা, রঙিন আলো দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু কোন মিসাইল ছুটে এল না।

চ্যানেলের মুখে পাহাড়, খাড়া একটা পাঁচিল যেন—স্যাঁৎ করে পিছিয়ে গেল, সেই সাথে আবার উন্মুক্ত হলো প্রশস্ত সাগর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা, প্লেনের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে কোর্স বদল করল।

সাব-সোনিকে নেমে এল প্লেনের গতি। ওকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছোঁড়া হয়নি, কারণটা বুঝতে পারল রানা। এত নিচু দিয়ে এসেছে ও, মিসাইল ছুঁড়লে সেটা পাথরের পাঁচিলে গিয়ে আঘাত করত।

নতুন কোর্স ধরে উত্তর-পশ্চিম দিক যাচ্ছে মিগ-৩১। এই কোর্স ধরে গেলে স্পিটবারজেন আর ফ্র্যাঞ্জ যোশেফ ল্যান্ডের মাঝখানে আইসপ্যাকের কিনারায় পৌঁছুবে ও। তার অনেক আগেই অবশ্য এয়ারকিঙের ফুয়েল শেষ হয়ে যাবে। পৌঁছুবার অনেক আগেই মারা যাবে রানা। ধূসর রঙের সাগর দেখতে অনেকটা কার্পেটের মত লাগল, প্রায় নিরেট।

নিঃসঙ্গতা অস্থির করে তুলল ওকে। পিক-আপ কোন সিগন্যাল দিচ্ছে না। খারাপ দিকগুলোই বারবার উঁকি দিল মনে। ওটা কি নষ্ট হয়ে গেছে? রাশিয়ানদের চোখে ধরা পড়ার ভয়ে দূরে কোথাও সরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে রিফুয়েলিং ভেসেল? ওকে ফুয়েল সাপ্লাই দেয়ার জন্যে সত্যিই কি কেউ আছে সামনের দিকে?

স্ক্রীন ফাঁকা, মাথার ওপর আকাশ শূন্য, নিচে সাগর খালি।

ধোঁয়াটে সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে মিগ-৩১, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে ফুয়েল।

কেউ জানে না কি আছে ওর ভাগ্যে।

স্পাই ট্রলার থেকে রিপোর্ট এল, তারপর ম্যাটোচকিন শার থেকে এল কনফারমেশন রিপোর্ট–মিগ-৩১ দেখা গেছে। ওঁরা সবাই এতক্ষণে নিশ্চিতভাবে জানলেন, পিটি ডাভ বেঁচে আছে। ব্যাজার বিস্ফোরণে মারা যায়নি সে।

টেবিলে আর্কটিক ম্যাপ।

বিস্ফোরিত হতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়েছেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। পিটি ডাভ এখনও বেঁচে আছে, মিগ-৩১-কে এখনও ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। নিজেকে সামলে নিয়ে উপস্থিত সবাইকে তিনি শুধু একটা কথাই বলেছেন, 'কিভাবে কি করবেন আমি জানি না, আমি চাই ও যেন মিগ-৩১ নিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে।'

তটস্থ একটা ভাব লক্ষ করা গেল যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল বাকুনিনের চেহারায়। কিন্তু এয়ার মার্শাল ঝনঝেনিৎসিনকে নির্লিপ্ত মনে হচ্ছে। তিনি তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আর কোনদিকে খেয়াল দেয়ার সময় নেই।

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাপ দেখছেন তিনি। নোভাইয়া জেমলাইয়া পেরুবার পর পিটি ডাভ যে কোর্স ধরেছে তা আন্দাজ করতে যদি ভুল না হয়ে থাকে, পিটি ডাভ এখনও জানে না, সরাসরি মিসাইল ক্রুজার আর তার দুই অ্যাটেনড্যান্ট হান্টার-কিলার সাবমেরিনের দিকে যাচ্ছে সে। এটা একটা ফাঁদ হিসেবে কাজ করবে। আরও একটা ফাঁদ তৈরি করতে পারেন তিনি।

মিগ-৩১ চিরস্থায়ী নিরেট বরফের দিকে যাচ্ছে, সম্ভাব্য ল্যান্ডিং ফিল্ড ওদিকেই কোথাও হবে। ওই এলাকায় সার্চ প্লেন পাঠাবার নির্দেশ দিলেন তিনি।

পিটি ডাভকে থামানো সম্ভব। রিগার বর্তমান অবস্থানের ওপর আঙুল দিয়ে টোকা দিলেন তিনি। এই মুহূর্তে রিগার দুই অ্যাটেনড্যান্ট– মিসাইলবাহী, ডিজেল চালিত, এফ শ্রেণীর অ্যান্টি-সাবমেরিন সাবমেরিন– পানির নিচে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

মিসাইল ক্রুজারকে রক্ষার জন্যে ওগুলো সাব-সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল বহন করে। যদিও বিমান হামলা থেকে বাঁচার জন্যে রিগার নিজস্ব ফায়ার-পাওয়ারই যথেষ্ট।

'নির্দেশ দাও রিগা যেন তার বর্তমান পজিশনে থাকে,' বললেন তিনি। 'এসকর্ট দুটোকে এই মুহূর্তে পানির ওপর উঠতে বলো।'

'নির্দেশ পাঠানো হলো, এয়ার মার্শাল,' অপারেটর বলল।

'জেনারেল অ্যালার্ট, রেড ব্যানার ফ্লিটের সব জাহাজের জন্যে,' একের পর এক নির্দেশ দিয়ে চলেছেন ঝনঝেনিৎসিন। 'পিটি ডাভের আন্দাজ করা কোর্স বদল হতে পারে, সেজন্যে জাহাজগুলোকে তৈরি থাকতে বলো। ওই কোর্সটা জানিয়ে দাও ওদের।'

'নির্দেশ পাঠানো হলো, এয়ার মার্শাল।'

'পিটি ডাভের ফুয়েল সাপ্লাই সম্পর্কে কি জানি আমরা?'

অপর একটা কণ্ঠস্বর থেকে ত্বরিৎ জবাব এল, 'কমপিউটর বলছে আর দুশো মাইলও যেতে পারবে না।'

'এই হিসেব কতটা নির্ভুল?'

'ভুল হবার সম্ভাবনা শতকরা ত্রিশ ভাগ, তার বেশি নয়, এয়ার মার্শাল।'

তারমানে যে ফুয়েল আছে তাতে পিটি ডাভ হয় একশো চল্লিশ মাইল, অথবা প্রায় তিনশো মাইল যেতে পারবে। চিবুকে আঙুল ঘষলেন ঝনঝেনিৎসিন। অর্থাৎ পোলার-প্যাকের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারছে না মিগ-৩১। আর পোলার-প্যাকে পৌঁছুতে না পারলে সাগরে বিধ্বস্ত হবে প্লেনটা। এর দ্বিতীয় কোন উত্তর নেই। আবার ম্যাপটা পরীক্ষা করলেন তিনি। 'এলাকায় অচেনা কোন এরিয়াল অ্যাকটিভিটি আছে?'

'নেই, এয়ার মার্শাল। আকাশ এখন পরিষ্কার।'

‘ঠিক আছে।’ ম্যাপে চোখ রেখে ভাবছেন এয়ার মার্শাল, পিটি ডাভ এখন বেশি ওপরে উঠবে না, ফুয়েলের কথা ভেবে স্পীড বাড়াবার সাহস হবে না তার। যতটা সম্ভব সাগরের গা ঘেঁষে থাকতে হবে তাকে। তা যদি হয়, ভাগ্য ভালই বলতে হবে, কারণ ক্রুজার থেকে খালি চোখে দেখে মিসাইল ছোঁড়া যাবে, ক্লোজ রেঞ্জে। আর তা না হলে ইনফ্রা-রেড উইপনস এইমিং-এর ওপর নির্ভর করতে হবে। মনটা খুঁত খুঁত করছে এয়ার মার্শালের। রিগায় যে ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে সেটা অত্যাধুনিক নয়। তবে, কাজ চালানো যায়, কাজ চালাতেই হবে...

চিন্তায় বাধা পড়ল। কে একজন বলল, ‘এয়ার মার্শাল, টাওয়ার থেকে রিপোর্ট—মেজর মিখাইল রাভিক। পিপি-টু টেক-অফ করার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে।’

মুখ তুলে ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে তাকালেন এয়ার মার্শাল। ফার্স্ট সেক্রেটারি তাঁরই দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, তাঁর কাছ থেকে কিছু আশা করা হচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কি তা তিনি জানেন না। এখন আর দ্বিতীয় মিগ-৩১-কে প্রথমটার পিছনে পাঠিয়ে কোন লাভ নেই। পিটি ডাভ তিন হাজার মাইল দূরে চলে গেছে। তাছাড়া, তার ফুয়েলও তো প্রায় শেষ হয়ে এল। তার আর জ্বালানি পাবার কোন উপায় নেই, কাজেই কেউ বাধা না দিলেও সাগরে ধ্বংস হয়ে যাবে পিপি-ওয়ান।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, ‘পাইলট কে?’

‘আমি...আমার ঠিক জানা নেই...’ প্রশ্নটা শুনে বিস্মিত হলেন ঝনঝেনিৎসিন।

‘বেরেনকো,’ জেনারেল বাকুনিন বললেন। ‘মেজর বোরিস বেরেনকো।’

‘সময় কম, আমি সেটা বুঝি,’ ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন,

'তবু ওর সাথে কথা বলব আমি।'

ফার্স্ট সেক্রেটারি কি চাইছেন, বুঝতে পারলেন এয়ার মার্শাল। বেরেনকোকে এখুনি টেক-অফ করতে বলবেন তিনি, ম্যাক্সিমাম স্পীড তুলে পিপি-ওয়ানকে ধাওয়া করার নির্দেশ দেবেন। নোভাইয়া জেমলাইয়াতে পৌঁছুতে বেরেনকোর এক ঘণ্টারও কম সময় লাগবে। তাঁর ধারণা, সময় আর জীবনী-শক্তির অপব্যয় ছাড়া আর কিছু হবে না সেটা। তবু, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তিনি বললেন, 'অবশ্যই, ফার্স্ট সেক্রেটারি।' অপারেটরের দিকে ফিরলেন। 'এখুনি তলব করো বেরেনকোকে। টাওয়ারকে বলো, টেক-অফের জন্যে সব রকম প্রস্তুতি নিক।' রিফুয়েলিং প্লেনগুলোকে সতর্ক করে দিতে হবে, পিটি ডাভ যেখানে উপকূল পেরিয়েছে তার খানিক পশ্চিমে পিপি-টু-র জন্যে অপেক্ষা করবে ওগুলো। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন তিনি। একটা প্রহসন ছাড়া এ আর কিছুই নয়, মনে মনে হাসলেন। পিটি ডাভ তার রিফুয়েলিং পয়েন্টে কোনদিনই পৌঁছুতে পারবে না, পিপি-ওয়ান-কে মিসাইল ছুঁড়ে ঠিকই ধ্বংস করে দেবে রিগা...কিন্তু এসব কথা বলে কোন লাভ নেই। বলার পর যদি অন্য রকম কিছু ঘটে, হিতে বিপরীত হবে।

পিক-আপ এখনও কোন সিগন্যাল দিচ্ছে না। ফুয়েল গজের কাঁটা লাল বিপদ সঙ্কেতের ওপর কাঁপছে, রিজার্ভ ফুয়েলও শেষ হয়ে এল বলে। বেশ কয়েক মিনিট হয়ে গেছে রিজার্ভ ট্যাংকের সুইচ অন করেছে রানা, কিন্তু ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই। কিন্তু জানে আর মিনিট দুয়েকের মধ্যে রিফুয়েলিং পয়েন্ট থেকে পাঠানো সিগন্যাল না পেলে মারা যাবে ও। শুধু সিগন্যাল পেলে হবে না, কাছাকাছি কোথাও থেকে পাঠানো হলে তবেই সেখানে পৌঁছুতে পারবে ও। তা না হলে পৌঁছুবার আগেই

নিঃশেষ হয়ে যাবে রিজার্ভ ফুয়েল।

সাগর এখনও ফাঁকা। রাডার স্ক্রীন অর্থাৎ আকাশও খালি।

এখনও বেঁচে আছে ও, শ্বাস নিচ্ছে, কিন্তু মৃত্যু আর বেশি দূর নয়।

সি.আই.এ-র রিফুয়েলিং পয়েন্ট জাহাজ নাকি প্লেন, জানা নেই ওর। প্লেন হবারই সম্ভাবনা বেশি। প্লেনটা হয়তো রাশিয়ান ডি.ই.ডব্লিউ. লাইন পেরোবার চেষ্টা করেছিল, ধরা পড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে।

রাডারে বড় আকারের একটা সারফেস ভেসেল দেখা গেল। কোর্স সামান্য বদল করার জন্যে হাত দুটো তৎপর হয়ে উঠল, লক্ষ করল, স্ক্রীনে আরও দুটো ব্লিপ–সারফেস ভেসেলের দু'পাশে। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। নিশ্চই রাশিয়ান মিসাইল ক্রুজার, সাথে এক জোড়া অ্যাটেনড্যান্ট সাবমেরিন। সরাসরি ক্রুজারের দিকে এগোচ্ছে এয়ারকিং।

বর্তমান স্পীডে এক মিনিট লাগবে টার্গেটে পৌঁছুতে। আপনমনে হাসল রানা। টার্গেট! মিসাইল ক্রুজার! টার্গেট তো আসলে সে নিজেই। কোন সন্দেহ নেই, জাহাজের ইনফ্রা-রেড এরই মধ্যে ওকে সনাক্ত করতে পেরেছে। হাইট, রেঞ্জ ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য ফায়ার-কন্ট্রোল কমপিউটরে চলে গেছে।

মরতেই যদি হয়, এয়ারকিং সত্যি কি করতে পারে সেটা দেখে মরবে। বর্তমান কোর্সে স্থির থেকে আত্মহত্যার কোন ইচ্ছে নেই ওর। মরতে হবে জানে, কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়ার বান্দা মাসুদ রানা নয়।

ওর কাছে এটা আত্মরক্ষার যুদ্ধ। সামনে টার্গেট–এক মিনিটের পথ।

এই সময় পিক-আপ সিগন্যাল দিল। ওটার দিকে তাকাল না রানা, দেখল না সিগন্যালটা কতদূর থেকে আসছে। জীবন আর

মৃত্যুর মাঝখানে কতটা দূরত্ব, জানার সময় নেই। মিসাইল ক্রুজার আর সাবমেরিন দুটো এগিয়ে আসছে, চোখের পলক না ফেলে রাডারের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ডিসট্যান্স-টু-টার্গেট রিড-আউট–ত্রিশ সেকেন্ড। প্রায় জিরো হাইটে রয়েছে ও, তাই কিছু বোঝার আগেই ওগুলোর ঠিক ওপরে চলে এল মিগ-৩১।

এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পিক-আপ থেকে বিরতিহীন যান্ত্রিক আওয়াজ বেরুচ্ছে, ত্রাহি চিৎকারের মত শোনাল কানে। একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে আছে রানা, খালি চোখে মিসাইল ক্রুজারকে দেখতে পাবার আশায়।

মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করবে, এখন তারই অপেক্ষা।

পাঁচ

টার্গেট আর পঁচিশ সেকেন্ডের পথ।

ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করল রানা। পিক-আপ রিড-আউট থেকে জানা গেল, সরাসরি মিসাইল ক্রুজারের পিছন থেকে সিগন্যাল পাঠানো হচ্ছে। ফুয়েল গজে চোখ বুলিয়ে বুঝল, ঘুরপথে যাবার ঝুঁকি নেয়া চলে না। কাজেই মিসাইল ক্রুজারের ভয়াবহ-ফায়ার পাওয়ার অগ্রাহ্য করে দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী সরল রেখা ধরেই যেতে হবে তাকে। রাডার থেকে জানা গেল, মিসাইল ক্রুজারের পোর্ট আর স্টারবোর্ড সাইডে রয়েছে সাবমেরিন দুটো, প্রতিটি প্রায় তিন মাইল তফাতে। ওগুলো এখন পানির ওপর ভেসে উঠে যার যার ইনফ্রা-রেড সিস্টেম এয়ারকিঙের দিকে তাক করে রেখেছে। রানা যদি জিরো ফিটেই থাকে, ওর দিগন্তরেখার ওপর ওগুলোকে দেখা যাবে, কিন্তু ওগুলোর ফায়ার-কন্ট্রোল

সিস্টেম এয়ারকিঙের দিকে লক্ষ্যস্থির করতে সমস্যার মধ্যে পড়বে। তার মানে, রানার দুশ্চিন্তা শুধু মিসাইল ক্রুজারটাকে নিয়ে। ওর সবচেয়ে কাছে যে সাবমেরিনটা থাকবে সেটা, কোন্‌টা থাকবে তা নির্ভর করবে ক্রুজারের কোন্‌ পাশ দিয়ে যাবে ও, ইনফ্রা-রেড মিসাইল ছোঁড়ার ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না, কারণ এত কাছে ক্রুজার আর তার বিশাল টারবাইন থাকায় সেইম-সাইড হয়ে যাবার ভয় আছে।

এয়ারকিঙের বিরুদ্ধে ক্রুজার থেকে কি কি অস্ত্র ব্যবহার করা হতে পারে তার একটা হিসেব করল রানা। ওর যা গতি, চোখে দেখে কামান দাগার প্রশ্ন ওঠে না। টর্পেডো-টিউব শুধু সাবমেরিনের বিরুদ্ধে কাজ করবে, জোড়া মাউন্টিংয়ে চারটে মর্টারও তাই। হান্টার কিলার হেলিকপ্টার দুটো আকাশে থাকতে পারে, কিন্তু ওগুলোয় এয়ার-টু-এয়ার উইপনস নাও থাকতে পারে। ষাট মিলিমিটার কামানগুলো রয়েছে ব্রিজের সামনে, ইলেকট্রনিক কমপিউটারাইজড ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে ওগুলো। কামানগুলোর সাথে সার্চ রাডার সংযোগ আছে। সার্চ রাডার ইনফ্রা-রেডেও পরিচালিত হয়। তবু এসব ভীতিকর কিছু নয়—অন্তত রানার জন্যে। এই স্পীডে, এই জিরো ফিটে, ক্রুজারের খুব কাছ দিয়ে মিগ-৩১ উড়ে গেলে এগুলোর কোনটাই লক্ষ্যস্থির করার জন্যে যথেষ্ট নোয়ানো যাবে না।

ক্রুজারের অস্ত্রগুলো এক এক করে বাতিল করে দিল রানা, শুধু সারফেস টু-এয়ার মিসাইল লঞ্চার চারটে বাদে। ওগুলো এস.এ.এন-থ্রী শ্রেণীর। সারফেস-টু-সারফেস অ্যান্টি-সাব-মিসাইল ওর জন্যে কোন হুমকি নয়। কিন্তু এস.এ. মিসাইলে ইনফ্রা-রেড আছে, ওগুলো তাপ-উৎস সন্ধানী।

ভরসা রিয়ার ওয়ার্ড ডিফেন্স পড। মনে মনে রানা প্রার্থনা করল, ওটা যেন কাজ করে। এস.এ. মিসাইল লঞ্চারগুলো ব্রিজ

সুপারস্ট্রাকচারের সামনে, জাহাজের আফটার কোয়ার্টার চারটে কামোভ হেলিকপ্টারের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

ক্রুজারের ক্যাপ্টেন ঠিক কি ধরনের নির্দেশ পেয়েছে, জানা থাকলে ভাল হত। ক্যাপ্টেন কি মিগ-৩১-এর টেইল-ইউনিট, ফায়ার-পাওয়ার বা স্পীড সম্পর্কে সব তথ্য জানে?

এতসব ভাবতে মাত্র চার সেকেন্ড লাগল রানার। রিড-আউট-টার্গেট আর একুশ সেকেন্ডের পথ। মাইলের হিসেবে দুই পয়েন্ট দুই মাইল দূরে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সামনে জাহাজের আকৃতি দেখতে পাবে ও।

এয়ারকিঙের পেটের নিচ দিয়ে বরফের একটা বিশাল চাদর পিছলে বেরিয়ে গেল, ধূসর সাগরের গায়ে চোখ ধাঁধানো সাদা তার রঙ। কয়েক মিনিট আগে থেকেই এ ধরনের বরফের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ করেই দেখতে পেল ক্রুজারটাকে। দিগন্ত রেখার ওপর নিচু একটা আকৃতি, ভয়াবহ গতিতে কাছে চলে আসছে। গায়ে কাঁটা দিল রানার। জানে ব্রিজের লোকজন এয়ারকিংকে দেখতে পাচ্ছে—ওদের চোখে ধূসর রঙের একটা সামুদ্রিক পাখি, হিম-শীতল পানির ঠিক ওপরে যেন স্থির হয়ে আছে। রানার চোখ স্ক্রীনের দিকে, জাহাজের গা থেকে মিসাইল ছুটলেই অকস্মাৎ রঙ ফুটে উঠবে স্ক্রীনে। ছোঁড়ার মুহূর্তে এস.এ. মিসাইল উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা বিন্দু হয়ে ধরা পড়বে।

রাডারে একটা বিন্দু ফুটে উঠল, ওটা সম্ভবত ক্রুজারের একটা কামোভ হেলিকপ্টার। ই-সি-এম রিড-আউট দেখে হাইট আর রেঞ্জ কত জানা গেল। একটা এ.এ. মিসাইল ছোঁড়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা, তাতে ক্রুজারের ফায়ার-কন্ট্রোল কমপিউটর বিভ্রান্ত হলেও হতে পারে।

মিসাইল ছুঁড়ল রানা। প্লেন থেকে বেরিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সেটা, প্লেনকে ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেল, তারপর স্যাঁৎ করে

অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের দিকে। স্ক্রীনে চোখ রেখে মিসাইলটাকে দেখছে রানা।

ক্রুজারের ডেক ম্লান আলোয় ঝলসে উঠল, স্ক্রীনে সেটা ধরা পড়ল উজ্জ্বল আলো হয়ে। এতক্ষণ ওরা অপেক্ষা করছিল, ধরে নিয়েছিল সাবমেরিন আর হেলিকপ্টারের ভয়ে দিক বদল করবে ও। অথচ সেই আগের কোর্সেই স্থির থাকল রানা, সরাসরি ওদের দিকে ছুটল মিগ-৩১। যেমন আশা করেছিল ও, ওর তরফ থেকে হেলিকপ্টারের ওপর হামলা হতে দেখে ব্রিজের ফায়ার-কন্ট্রোলের ট্রিগার টেনে দেয়া হয়েছে। ওর মাথার ওপর বিস্ফোরিত হলো হেলিকপ্টার, আকাশে যেন আচমকা একটা উজ্জ্বল কমলা রঙের ফুল ফুটল, পাপড়িগুলো ডিগবাজি খেতে খেতে নিচের দিকে নামছে।

ওরা চেয়েছিল ক্রুজার আর একটা সাবমেরিনের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাবে মিগ-৩১, আশা করেছিল দিক বদলে অনেক ওপর দিয়ে ওদেরকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে পাইলট। কিন্তু ঘটল ঠিক উল্টোটা। রানাকে হামলা চালাতে দেখে সাথে সাথে পাল্টা হামলা চালিয়ে বসেছে ক্যাপ্টেন।

আর মাত্র কয়েকশো গজ সামনে জাহাজটা। ব্রিজের সামনের অংশ থেকে এক জোড়া এস.এ. মিসাইল উঠে এল। প্লেন কাত করল রানা, পোর্ট সাইডের দিকে মেলে দিল প্লেনের পেট, এই ভঙ্গিতে ক্রুজারটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে যাবে। ওর সামনের স্ক্রীনে দেখা গেল নিজেদের কোর্স থেকে সামান্য একটু সরে এসেছে মিসাইলগুলো, ধাওয়া শুরু করেছে এয়ারকিংকে।

প্রতি মুহূর্তে কাছে চলে আসছে মিসাইলগুলো।

ধ্যান-মগ্ন যেন রানা। আগেই থট গাইডেড উইপনস সিস্টেমের সুইচ অন করে রেখেছে, এই মুহূর্তে আদর্শ সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছে ও, সেই সাথে আনুষঙ্গিক সমস্ত চিন্তা-

ভাবনা বাদ দিয়ে শুধু নির্জলা নির্দেশ আর সিদ্ধান্তগুলো অন্তরের অন্তস্তলে গুছিয়ে নিচ্ছে।

মিসাইলগুলো কোথায় রয়েছে জানে রানা, জানে প্লেনের সাথে ওগুলোর দূরত্ব কতটুকু। প্লেন আর মিসাইলের গতির মধ্যে তফাৎ কতটা তাও অজানা নয়। সমস্ত তথ্য সাজিয়ে অপেক্ষা করছে ও।

মনে হলো, এখনই আদর্শ সময়। নির্দেশটা নিঃশব্দে দিল রানা।

থট-গাইডেড উইপনস-সিস্টেম টেইল-ইউনিটের ট্রিগার টেনে দিল। অকস্মাৎ ওর পিছনে বিশাল এক ঝলক আলো বিস্ফোরিত হলো, ম্লান হয়ে গেল সূর্য। এক ঝটকায় থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিল রানা, প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে পানির ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটল মিগ-৩১। সাগরের ঢেউ আলাদা ভাবে চেনা গেল না, পলকের জন্যে ককপিটের ওপরে ঝুলে থাকতে দেখা গেল জাহাজের বো। জাহাজের পাটাতন থেকে পঞ্চাশ গজ ওপর দিয়ে উড়ে এল এয়ারকিং।

ওর পিছনে টেইল-ইউনিট থেকে বেরিয়ে গেছে একটা হিট-সোর্স—ঝাড়া চার সেকেন্ড ধরে প্লেনের দুটো টারমানস্কি টারবো জেটের চেয়ে বেশি তাপ নিয়ে জ্বলল সেটা, তাপ-সন্ধানী মিসাইল দুটোকে সাদরে কাছে টেনে নিল। আগুনের গোলা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হলো স্ক্রীনে, চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। তারপর হঠাৎ করেই নিভে গেল আলোটা। স্ক্রীনে এখন ক্রুজারটা এক মাইলেরও বেশি পিছনে পড়ে গেছে, স্পীড সুপারসোনিকে তুলে দিয়েছে রানা।

ফুয়েল গজের কাঁটা শূন্যের ঘরে স্থির হয়ে আছে। মাক কাউন্টারে স্থির হয়ে আছে মাক ওয়ান পয়েন্ট সিক্স। অলটিমিটার রিডিং—সাগরের পিঠ থেকে পঞ্চাশ গজ ওপরে রয়েছে মিগ-৩১। এত নিচে থাকায় সাবমেরিন দুটোর দৃষ্টি আর ইনফ্রা-রেড থেকে

বেঁচে আছে ও। তবে ইতোমধ্যে ক্রুজারের কাছ থেকে প্লেনের রেঞ্জ আর বেয়ারিং পেয়ে গেছে ওরা।

স্ক্রীনের দিকে তাকাল রানা। আরও দুটো এস.এ. মিসাইল আসছে। সন্দেহ নেই, ক্রুজারের ক্যাপ্টেন হতভম্ব হয়ে পড়েছে। ভাল টার্গেট পাবার অপেক্ষায় ছিল সে, কিন্তু রানাকে হেলিকপ্টারের ওপর হামলা চালাতে দেখে তড়িঘড়ি পাল্টা হামলা চালাতে হয়েছে তাকে। আরও একটা ধাক্কা খেয়েছে সে এয়ারকিঙের টেইল-ইউনিটের কাছ থেকে। তা সত্ত্বেও আরও দুটো মিসাইল ছুঁড়েছে সে, যদিও জানে এ-দুটোরও একই অবস্থা হতে পারে...

স্ক্রীনের পোর্ট সাইডের কিনারায় আরও এক জোড়া ম্লান বিন্দু দেখল রানা। ওর সবচেয়ে কাছের সাবমেরিনটা থেকে আরও এক জোড়া মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে, এয়ারকিঙের এগজস্ট লক্ষ্য করে তীব্র বেগে ছুটে আসছে সেগুলোও।

পিক-আপ সিগন্যাল চেক করল রানা। এখনও নাক বরাবর সামনে থেকে আসছে সিগন্যালটা। সিগন্যালের উৎস এখনও একশো ষাট মাইল দূরে।

স্পীড কমানো উচিত নয়, তবু কমাল রানা। দূর থেকে স্ক্রীনের চারটে বিন্দু আরও দ্রুত গতিতে ছুটে এল। টেইল-ইউনিট নিখুঁতভাবে কাজ করেছে, কিন্তু এবার ওটার সাহায্য এখুনি না নিয়ে নতুন একটা পরীক্ষা চালাতে চায় রানা। জানে জুয়া খেলার মত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থাটা পরখ না করলেই নয়। দৌড় প্রতিযোগিতায় মিসাইলগুলোকে পরাজিত করতে চাইছে ও।

থ্রটল সামনে ঠেলে দিতেই চমকে ওঠা হরিণের মত লাফ দিল এয়ারকিং, উড়ে চলল আতঙ্কিত একটা পাখি যেন।

পিছিয়ে পড়ছে মিসাইলগুলো, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অন্য কোন

দিকে সরে যাচ্ছে না। পিছু নিয়ে আসছে, আসতেই থাকবে। দশ মাইল এগোল রানা। বিশ মাইল। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ...আরও পিছিয়ে পড়ল চারটে মিসাইল, কিন্তু তাড়া করে আসছে এখনও।

অপেক্ষার কোন মানে হয় না। তৈরি হয়ে নিল রানা।

টেইল ইউনিট আবার মিসাইল ছাড়ল। বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেল রানা, শক-ওয়েভ কাঁপিয়ে দিল প্লেনটাকে। থ্রটল নিজের দিকে টেনে নিল রানা, একশো সত্তর নটে নেমে এল গতি।

ফুয়েল গজের দিকে আর তাকাল না ও। পিক-আপ আগের মতই সিগন্যাল দিয়ে যাচ্ছে। রিফুয়েলিং পয়েন্ট আর একশো মাইলও দূরে নয়। কিন্তু রিজার্ভ ট্যাংকে ফুয়েল যা আছে তাতে আর দু'চার মাইলও যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। রিজার্ভ ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে কোইভিসতু ওকে কিছুই বলতে পারেনি।

বরফের বিশাল খণ্ড এখন ঘন ঘন দেখা যাচ্ছে। কোনটা লম্বায় কয়েকশো গজ, কোনটা আরও অনেক ছোট বা আরও অনেক বড়।

উত্তর দিকে ছুটছে মিগ-৩১। ভাগ্যের ওপর ঠিক রাগ নয়, অভিমান হলো রানার–রিফুয়েলিং পয়েন্টের এত কাছে এসে ফুয়েলের অভাবে বিধ্বস্ত হবে এয়ারকিং? মরতে হয় মরবে, বিপজ্জনক একটা দায়িত্ব কাঁধে নিলে সে ঝুঁকি তো সব সময়ই থাকে, কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে মিগ-৩১ নিয়ে নামতে না পারলে মনে একটা দুঃখ থেকে যাবে ওর। মরেও শান্তি পাবে না।

পিপি-ওয়ানকে পিপি-টু ধাওয়া করবে, ধারণাটা এয়ার মার্শালের পছন্দ না হলেও, পিপি-টুর পাইলট মেজর বোরিস বেরেনকোকে তিনিই ব্রিফ করলেন। ফুল স্পীডে উত্তর দিকে যাবে বেরেনকো, মিগ-৩১-এর বিস্ময়কর শক্তির সবটুকু ব্যবহার করবে। রাশিয়ার

উত্তর উপকূল রেখার কাছে একটা ট্যাংকার-প্লেনের সাথে মিলিত হবে পিপি-টু, ওখান থেকে মিসাইল ক্রুজার রিগার বর্তমান পজিশনের দিকে যাবে। রিগা থেকে এখনও কোন রিপোর্ট আসেনি, সেজন্যে দুশ্চিন্তায় আছেন ঝনঝেনিৎসিন। রিগার কাছাকাছি আরও একটা ট্যাংকার অপেক্ষায় থাকবে, আবার যদি পিপি-টুর ফুয়েল দরকার হয়। ওই ট্যাংকার থেকে সাপ্লাই পাওয়া যাবে। ট্যাংকারগুলো এরই মধ্যে যার যার নির্দিষ্ট পয়েন্টে পৌঁছুনোর জন্যে রওনা হয়ে গেছে।

বেরেনকো রেড এয়ারফোর্সের সিনিয়র টেস্ট পাইলট, বিলিয়ারস্ক প্রজেক্টে কর্নেল বেনিনের সাথেই কাজ করছে, যদিও বেনিনের ফ্লাইটআওয়ার রেকর্ড তারচেয়ে অনেক ওপরে। বেরেনকো তরুণ, প্রাণ শক্তিতে ভরপুর, সুদর্শন এবং পাইলট হিসেবেও সুদক্ষ। ফার্স্ট সেক্রেটারি নিজে তার সাথে দুটো কথা বললেন। বেরেনকোর আত্মবিশ্বাস আর উৎসাহ লক্ষ করে খুশি হলেন তিনি। বললেন, 'আমি শুধু তোমাকে একটা কথাই বলব, বেরেনকো—সোভিয়েত রাশিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে চলেছে, যেভাবে পারো ঠেকাও সেটা। তোমার ওপর আমার আস্থা আছে।'

এত বড় দায়িত্ব পেয়ে, খোদ ফার্স্ট সেক্রেটারির মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনে গর্বে বেরেনকোর বুক ফুলে উঠল। 'যদি সম্ভব হয় সাধ্যের বেশি চেষ্টা করব আমি,' বলে ওঅর কমান্ড সেন্টার থেকে বেরিয়ে গেল বেরেনকো।

কর্নেল বেনিন সম্পর্কে একটা খবর এল। পাইলটদের রেস্ট-রূমে আগেই পাওয়া গেছে তাকে। অজ্ঞান করে একটা লকারে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল বেচারাকে। কে.জি.বি-র ডাক্তাররা পরীক্ষা করে জানিয়েছে, জ্ঞান ফিরতে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে।

দ্বিতীয় মিগ-৩১ তৈরি হয়ে মেইন রানওয়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। টাওয়ারের কাছ থেকে চূড়ান্ত অনুমতি পাবার অপেক্ষায়

রয়েছে ওটা। ডিম্বাকৃতি টেবিল থেকে উঠে গিয়ে একটা জানালার পাশের সীটে বসেছেন ফার্স্ট সেক্রেটারি পিপি-টুর টেক-অফ দেখবেন বলে।

টেবিল ছেড়ে নড়েননি ঝনঝেনিৎসিন। তাঁর পাশে যুদ্ধমন্ত্রী বাকুনিনও রয়েছেন। কে.জি.বি. চীফ উলরিখ বিয়েগলেভ অনেক আগেই ফিরে গেছেন মস্কোয়, দযেরঝিনস্কি স্ট্রীটের অফিসে বসে এই ব্যর্থতার জন্যে যারা দায়ী তাদের একটা তালিকা তৈরি করছেন তিনি। তালিকার প্রথম নামটা তাঁর নিজেরই হওয়া উচিত, কারণ জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স মিগ-৩১ চুরি করার প্ল্যান করছে এই গোপন খবরটা বাংলাদেশের তরফ থেকে তাঁকে একাধিকবার জানানো হয়েছিল, কিন্তু খবরটাকে তিনি ভিত্তিহীন বলে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। নিজের তৈরি তালিকায় তাঁর নাম থাকবে না, কিন্তু আসল সত্য ঠিকই এক সময় প্রকাশ পাবে। বলাই বাহুল্য, তাঁর শত্রুরা তখন তাঁর বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লাগবে।

মনে মনে একটা হিসেব করলেন ঝনঝেনিৎসিন। মিসাইল ক্রুজার আর তাঁর দুটো সাবমেরিনের কাছে পৌঁছুবার সময় হয়ে এসেছে পিটি ডাভের। মিগ-৩১-কে ধ্বংস করার এটাই তাদের শেষ সুযোগ। এখনও তিনি ধারণা করতে পারছেন না পিটি ডাভের রিফুয়েলিং পয়েন্ট আসলে কি। ওটা সাবমেরিন হতে পারে না। কারণ মিগ-৩১-কে সাবমেরিনে ল্যান্ড করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়নি। ওটা কোন প্লেন হতে পারে না, কারণ রাডার থেকে জানা যাচ্ছে ওই এলাকায় অচেনা কোন প্লেন নেই। মিগ নিয়ে সাগরে ঝাঁপ দেবে পিটি, তারপর একটা সাবমেরিন ওটাকে টেনে নিয়ে যাবে? সাগরের নোনা পানিতে ক্ষতি হবে প্লেনের, কিন্তু তবু আমেরিকানরা ক্ষতিগ্রস্ত প্লেন দেখে যা জানতে পারবে তাও কম নয়।

অথচ ওই এলাকায় অচেনা কোন সাবমেরিনও নেই।

এরপর থাকে নিরেট পোলার-প্যাক। কিন্তু অতদূর পর্যন্ত যেতে হলে যে ফুয়েল দরকার মিগ-৩১-এ তা নেই। হঠাৎ একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল তাঁর মনে। শেষ যেটুকু ফুয়েল আছে সেটুকু ব্যবহার করে যতটা সম্ভব আকাশের ওপর দিকে খাড়া উঠে যেতে পারে পিটি ডাভ, তারপর গ্লাইড করে নামবে–শুধু জেনারেটরগুলো চালু রাখলেই চলবে তখন, ফুয়েল খরচ হবে ধর্তব্যের বাইরে।

সন্দেহ নেই, এই চেষ্টার মধ্যে মস্ত ঝুঁকি থাকবে। হয়তো যতটা ওপরে ওঠা দরকার তার অর্ধেক ওঠার পরই নিঃশেষ হয়ে যাবে ফুয়েল। তাঁর মনে পড়ল, প্রতি হাজার ফিটে দু'মাইল গ্লাইড করতে পারবে মিগ-৩১। ফুয়েল থাকলে গ্লাইড করে পোলার প্যাকে পৌঁছুবার জন্যে যথেষ্ট ওপরে উঠতে পারবে পিটি ডাভ।

'রিগা থেকে মেসেজ এসেছে, এয়ার মর্শাল!' ঝনঝেনিৎসিনের কানে অপারেটরের কণ্ঠস্বর নিস্তেজ শোনাল। হাত দুটো মুঠো করে ঘুরলেন তিনি।

'অচেনা একটা প্লেনের দেখা পেয়েছে ওরা। ক্রুজার থেকে মিসাইল ছোঁড়া হয়েছিল, ইনফ্রা-রেড টাইপ, দুই গ্রুপে দুটো করে আর সাবমেরিন এসকর্ট থেকে এক গ্রুপে দুটো করে...'

'তারপর?'

'মিগের টেইল ইউনিট থেকে হিট সোর্স বেরিয়ে আসে, এয়ার মার্শাল। মিগ ধ্বংস হয়েছে কিনা ওরা বলতে পারছে না। প্লেনের সাথে মিসাইলের কন্ট্যাক্ট টাইমের আগেই রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় প্লেন, কিন্তু কন্ট্যাক্ট হয়েছে কিনা ক্যাপ্টেন নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারছেন না। যে প্লেনটাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন উনি সেটার টাইপ আর কেপ্যাবিলিটি সম্পর্কে জানতে চাইছেন...'

নিয়ম ভাঙতে চাইলেন না এয়ার মার্শাল। সমর-কৌশল

সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য গোপন রাখা রাষ্ট্রীয় নীতিমালার একটা অঙ্গ। শুধু যাকে না জানালেই নয় সে জানবে। 'বলো, সব কথা জানার তার দরকার নেই। চেষ্টা করেছে, সেজন্যে তাকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ দাও। আর বলো, পরবর্তী নির্দেশের জন্যে যেন তৈরি থাকে।' একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন ঝনঝেনিৎসিন। তারপর একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। 'টাওয়ারকে নির্দেশ দাও, এই মুহূর্তে টেক-অফ করবে পিপি-টু।'

রেডিও অপারেটর নির্দেশ ট্র্যান্সমিট করল।

'রিগা আর তার সাবমেরিন এসকর্টকে কোর্স বদলাতে বলো, ফুল স্পীডে উত্তর দিকে যাবে ওরা, মিগ যেদিকে গেছে।'

এনকোডিং-কনসোল তৎপর হয়ে উঠল।

ম্যাপের দিকে ফিরলেন ঝনঝেনিৎসিন। ঘামতে শুরু করেছেন তিনি। রিগা ব্যর্থ হয়েছে, এটা তাঁর কাছে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পিটি ডাভ রাশিয়ান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে, অথচ সত্যিকার অর্থে তার বিরুদ্ধে এখন তাদের আর প্রায় কিছুই করার নেই। কিন্তু তিনিও একজন অভিজ্ঞ যুদ্ধবিশারদ, শেষ চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ার পরও পরাজয় মানেন না, আরেকটা সুযোগ কাজে লাগাবার চেষ্টায় থাকেন।

'পোলার সার্চ স্কোয়াড্রনগুলোকে ইমিডিয়েটলি টেক-অফ করতে বলো,' নির্দেশ দিয়ে চললেন তিনি। 'মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ওতোভ আর পাভোনিকে নির্দেশ দাও, ফুল স্পীডে পোলার-প্যাকের দিকে যেতে হবে। পোলার প্যাকের সম্ভাব্য কোন্ জায়গায় পিটি ল্যান্ড করতে পারে কমপিউটর সেটা জানিয়েছে, লোকেশনটা ওদেরকে জানিয়ে দাও।'

নির্দেশ লিখে নিয়ে কোড করা শুরু হলো।

'ওই একই কোর্স ধরে যেতে হবে তিনটে ভি টাইপ সাবমেরিনকে।'

বাইরে, রানওয়েতে স্টার্ট নিল পিপি-টু। ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ঝনঝেনিৎসিন। সব শেষ হয়ে যায়নি এখনও, নিজেকে তিনি সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন। দরকার হলে পিটি ডাভের পিছু পিছু যত দূর যেতে হয় যাবেন তাঁরা। দরকার হলে আমেরিকানদের নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে আসা হবে মিগ-৩১-কে। দরকার হলে রাশিয়া যুদ্ধ...

ছয়

একটা ট্র্যান্সমিটার থেকে পাঠানো সিগন্যাল রিসিভ করছে পিক-আপ। ট্র্যান্সমিটারটা এখনও নব্বুই মাইল দূরে। ওখানে পৌঁছুতে হবে রানাকে।

কিন্তু ফুয়েল গজ শূন্য হয়ে গেছে।

আকাশের অনেক ওপরে উঠে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখছে না রানা। ইমার্জেন্সী ট্যাংকে কতটুকু ফুয়েল আছে ও জানে না, কিন্তু জানে যতটুকুই থাকুক, নব্বুই মাইল পাড়ি দেয়ার অনেক আগেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এই নব্বুই মাইল গ্লাইড করে যেতে হবে ওকে। ওটাই ওর একমাত্র ভরসা। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ফিট উঠে যেতে পারলে গ্লাইড করে নব্বুই মাইল পেরোতে ফুয়েল লাগবে সামান্যই। একবার শুধু উঠে যেতে পারলেই হয়।

খাড়া উঠতে শুরু করল মিগ-৩১। একে ফুয়েল কম, তার ওপর হু হু করে খরচ হয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করছে রানার। সামনে, অনেকটা দূরে ঘন কালো মেঘ চোখে

পড়ল। মেঘের নিচে সাদা একটা ঝাপসা রেখা–পোলার-প্যাক।

ষাট হাজার ফিট উঠে এসেছে মিগ-৩১। শুরু হলো নিঃশব্দ গ্লাইড।

রাডার স্ক্রীন এখনও ফাঁকা।

মার্কিন নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন হার্বার্ট জেমসন ইউ.এস.এস. শার্ক-এর একটা বাঙ্কে শুয়ে আছে। ইউ.এস.এস. শার্ক আণবিক শক্তি চালিত স্টারজিওন শ্রেণীর সাবমেরিন। বিশাল একটা বরফের মাঠ দক্ষিণ দিকে ভেসে চলেছে, আজ পাঁচ দিন তার তলায় গা ঢাকা দিয়ে আছে শার্ক।

শার্কের এই অভিযানকে তিনটে পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। কানেকটিকাট উপকূলে ছিল ওটা, নির্দেশ পেয়ে টপ স্পীডে আর্কটিক এলাকায় চলে আসে। পোলার প্যাকের তলায় ঢুকে আবার বেরিয়ে আসতে হয়েছে ওটাকে, ঢুকেছিল গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের কাছে, বেরিয়ে এসেছে ব্যারেন্ট সী-তে। সেটা ছিল অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়। তারপর থেকে ভাসমান বরফের নিচে আশ্রয় নিয়েছে শার্ক, ইঞ্জিন বন্ধ করে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। এটাই অভিযানের শেষ এবং তৃতীয় পর্যায়। একদিনে তিন দশমিক এক মাইল এগোচ্ছে শার্ক। এই মন্থরগতি শুধু বিরক্তিকর নয়, বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে। অফিসার আর ক্রুরা প্রচণ্ড একঘেয়েমিতে ভুগছে, স্নায়ুর ওপর চাপও কম পড়ছে না।

হার্বার্ট জেমসনের আরেকটা দুশ্চিন্তা, শার্ক নিরস্ত্র। সাবমেরিনের টর্পেডো রূম আর ফরওয়ার্ড কোয়ার্টারে ভরা হয়েছে হাই-অকটেন কেরোসিন। রাশিয়ার বিস্ময়, সুপার-প্লেন, মিগ-৩১-এ সাপ্লাই দেয়া হবে এই কেরোসিন।

অবশ্য পিটি ডাভ যদি ওটা চুরি করে আনতে পারে।

বয়স পঁয়তাল্লিশ, বিশ বছরের বেশি ইউ.এস. নেভীতে কাজ করছে জেমসন। চিরকুমার, অটুট স্বাস্থ্য, তার কাছে নিজের সাবমেরিন আর ক্রুদের নিরাপত্তার চেয়ে বড় কিছু নেই। প্রথম থেকেই ধারণাটা তার পছন্দ হয়নি। তাই সি.আই.এ-র অনুরোধ এড়িয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু তার পরই এল নৌ-বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও দায়িত্বটা কাঁধে নিতে হলো।

বাঙ্কের ওপর উঠে বসল জেমসন। মনটা তার অস্থির হয়ে আছে। তার ক্রুদেরকে একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে তারা। এদিকে পিটি ডাভেরও কোন দেখা নেই।

মৃদু শব্দে নক হলো দরজায়। অনুমতি পেয়ে কেবিনে ঢুকল একজন ক্রু। ওয়েদার-অফিসার রিপোর্ট পাঠিয়েছে। কাগজটা ক্রুর হাত থেকে নিয়ে পড়ল জেমসন। চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। বরফের ওপর বাতাসের গতি দ্রুত মন্থর হয়ে আসছে। লক্ষণ খারাপ। গোটা এলাকা জুড়ে মেঘ জমছে।

আবহাওয়া পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেলে আকাশ থেকে বরফের মাঠ দেখতেই পাবে না পিটি ডাভ, ভাবল জেমসন। ক্রুকে বিদায় করে দিল সে। কন্ট্রোল রূমে তার থাকা দরকার, কিন্তু ওখানে যেতে ভাল লাগছে না। তেমন কোন জরুরী খবর থাকলে ডিউটি অফিসাররা ঠিকই তাকে জানাবে। ভাল-মন্দ যাই হোক, খবরের জন্যে সবাই উন্মুখ হয়ে আছে। তবে বসে নেই কেউ, সবাই কাজে ব্যস্ত। বরফের সারফেস টেমপারেচারের ওপর কড়া নজর রাখতে হচ্ছে, টর্পেডো রূম আর ফরওয়ার্ড কোয়ার্টারে রাখা কেরোসিন কোথাও লিক করছে কিনা দেখতে হচ্ছে, আরও কত কাজ।

শুধু যে বাতাসের গতি কমে আসছে তাই নয়, সেই সাথে

টেমপারেচারও নামছে। এই কদিন অস্বাভাবিক ভাল ছিল আবহাওয়া, এমন দিনে যা আশা করা যায় না। এখন তা বদলাতে শুরু করেছে।

পিটি ডাভ যদি বরফের ওপর ল্যান্ড করতে না পারে.··

কে মরল, কি হারাল, এসবের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাবমেরিন আর ক্রুদের নিয়ে রাশিয়ানদের চোখ ফাঁকি দিতে পারা। তার ওপর নির্দেশ আছে, যে-কোন মূল্যে গ্রেফতার হওয়া এড়িয়ে যেতে হবে। মিগ-৩১ চুরির ব্যাপারে মার্কিন নৌ-বাহিনী জড়িত, এটা প্রকাশ পাওয়া চলবে না। তেমন প্রয়োজন দেখা দিলে, যদি আর কোন উপায় না থাকে, ইউ.এস.এস. শার্ক ডুবিয়ে দিতে হবে তাকে। তারমানে, আত্মহত্যা করতে বলা হয়েছে তাদের সবাইকে।

অভিযানে বেরিয়ে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসার পর গোপন নির্দেশে আরও জানানো হয়েছে তাকে, বরফের ওপর পিটি যদি ল্যান্ড করতে ব্যর্থ হয়, কিংবা এয়ারকিং যদি বরফে বা সাগরে বিধ্বস্ত হয়, শার্ক কাছাকাছি থাকলে অবশ্যই পাইলট আর প্লেনের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করতে হবে তাকে। প্লেনটাকে উদ্ধার করা সম্ভব হলে আইস প্যাকের তলা দিয়ে টেনে আনতে হবে কাছাকাছি মার্কিন নৌ ঘাঁটিতে।

হয়তো এসবের দরকার হবে না, পিটি ডাভ ঠিকই নিরাপদে ল্যান্ড করবে বরফের ওপর।

কিন্তু মুশকিল হলো, পাইলট দেরি করে ফেলেছে। এয়ারকিঙের রেঞ্জ আর ফুয়েলের অবস্থা সম্পর্কে জেমসন জানে। এরই মধ্যে কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গেছে। এয়ারকিঙের জন্যে কয়েক মিনিট মানে সময়ের ভয়ঙ্কর একটা ফাঁক—এই ফাঁক পাইলটের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

তথ্য বলতে প্রায় কিছুই জানা নেই জেমসনের। বিলিয়ারস্ক থেকে পিটি ডাভ এয়ারকিং চুরি করতে পেরেছে কিনা তা-ও সে

জানে না। প্লেনটা যদি আসে, কিংবা যদি না আসে, অথবা যদি সাবমেরিনের ইনফ্রা-রেডে ধরা পড়ে কিছু, তাহলেই ভাল-মন্দ কিছু একটা জানতে পারবে সে।

সাবমেরিন থেকে বরফ ভেদ করে ওপরে উঠে গেছে একটা সাদাটে মেটাল স্পাইক, বরফের গায়ে আলাদাভাবে চেনার উপায় নেই, স্পাইকের ডগায় রয়েছে বিশেষ ধরনের একটা ট্র্যান্সমিটার, পিটি ডাভের পিক-আপ সেটা থেকে সিগন্যাল রিসিভ করছে। ইসরায়েলি পাইলটের সাথে জেমসনের এটা একতরফা যোগাযোগ। পাইলটের পিক-আপ সিগন্যাল রিসিভ করবে, কিন্তু পাল্টা সিগন্যাল পাঠাতে পারবে না।

বরফের ওপর এয়ারকিং পৌঁছুলে পিটি যে সিগন্যাল পাচ্ছে সেটা বদলে যাবে। সিগন্যাল বদল হতে দেখেই পাইলট বুঝবে ঠিক নিচের বরফের ওপর ল্যান্ড করতে হবে তাকে।

কিন্তু আকাশে এখন ঘন কালো মেঘ। কিভাবে ল্যান্ড করবে পাইলট? আচমকা ঘন কুয়াশায় চারদিক ঢাকাও পড়ে যেতে পারে। আর্কটিকের আবহাওয়া সম্পর্কে ক'সেকেন্ড আগেও কিছু বলা যায় না।

কথাটা হাতুড়ি পেটার মত আঘাত করছে মনে, দেরি করে ফেলেছে পাইলট। মাত্র কয়েক মিনিট, কিন্তু লেট। এতক্ষণে নিশ্চই তার ফুয়েল নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই তো হবার কথা। বাঙ্ক থেকে নেমে পায়চারি শুরু করল ক্যাপ্টেন জেমসন।

সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারের ইমার্জেন্সী অপারেশন রূমে চাপা উত্তেজনা। খালি ব্রেকফাস্ট ট্রে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে লিলিয়ান আর আইলিন, কর্তাদের গম্ভীর চেহারা দেখে ফিরে আসতে সাহস পায়নি। খুদে কিচেনে কান খাড়া করে অপেক্ষায় আছে ওরা দু'জন, ডাক পড়লেই ছুটে আসবে।

কামরার একপাশে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন সি.আই.এ. চীফ রবার্ট মরগ্যান, আরেক পাশে পায়চারি করছেন জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স চীফ আইজাক ময়নিহান। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল সামনে নিয়ে চেয়ারে বসে ওদের দু'জনকে লক্ষ করছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, হাতে জ্বলন্ত পাইপ। টলব্যাট টেলিফোনে কথা বলছে, কিন্তু একেবারে নিচু স্বরে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে মাথা নিচু করে কি যেন চিন্তা করল টলব্যাট, দু'একবার মুখ তুলে চীফের দিকে তাকাল, তারপর সাহস করে বলে ফেলল, 'স্যার, ওই এলাকায় এবার আমরা ডিকয় সাবমেরিন...?'

পায়চারি থামিয়ে কর্কশ সুরে জানতে চাইলেন মরগ্যান, 'কি লাভ?'

পায়চারি থামিয়েছেন ময়নিহানও। 'কি লাভ মানে?' ঘন ভুরু কুঁচকে সি.আই.এ. চীফের দিকে তাকালেন তিনি। 'পিটি মারা গেছে তা এখনও আমরা জানি না...'

'ও, এখনও বুঝি আশা করছেন আপনি?' তিক্ত হাসলেন মরগ্যান। 'বিলিয়ারস্ক আর রিগার মাঝখানে যে কথাগুলো হলো, তার তাহলে অর্থ কি, আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন? আমি বলছি, আপনার পিটি আর নেই। মিগ-৩১ ধ্বংস করে দিয়েছে ওরা...'

'মেসেজটা স্পষ্ট নয়,' ঘরের মাঝখান থেকে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'এয়ারকিং ধ্বংস হয়নি, এই অর্থও করা যেতে পারে।'

অ্যাডমিরালের সমর্থন পেয়ে ময়নিহানের দু'চোখে আশার আলো জ্বলে উঠল। ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা, সবাই মরগ্যানের দিকে তাকিয়ে আছেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মরগ্যান ছোট্ট একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'ডিকয়।'

ছোঁ দিয়ে আবার টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল টলব্যাট, একটা নম্বরে ডায়াল করে কথা বলল। এই মুহূর্তে ডিকয় সাবমেরিন স্পিটবারজেনের পশ্চিমে রয়েছে, আর ডিকয় প্লেন সম্ভবত গ্রীনল্যান্ডে অথবা এরই মধ্যে পুবদিকের জমাট বরফের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। টলব্যাট ফোন করল এম.ও-ডি-র অপারেশন রূমে, সেখান থেকে প্লেন আর সাবমেরিনে পৌঁছে যাবে নির্দেশ। টলব্যাট রিসিভার নামিয়ে রাখল, ম্যাপের সামনে এসে দাঁড়ালেন মরগ্যান। রাশিয়ানদের মাটি আর সাগরের রাডারে ডিকয় প্লেনগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যে ধরা পড়ে যাবে, রাডারে দেখে বোঝা যাবে ওগুলো নর্থ কেপ-এর দিকে দ্রুত ছুটে চলেছে। আর ডিকয় সাবমেরিনগুলো রাশিয়ানদের সারফেস ভেসেল আর সাবমেরিনগুলোর চোখে ধরা দিয়ে পিছু নিতে প্ররোচিত করবে, গাধার সামনে মুলো ঝোলাবার মত করে ওগুলোকে শার্ক-এর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। কাজেই শার্ক বরফের তলা থেকে পানির ওপর ভেসে উঠলে কাছেপিঠে কোন রাশিয়ান ভেসেল থাকবে না।

রবার্ট মরগ্যান বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এখন তাঁর মনে হচ্ছে, এই অ্যাসাইনমেন্টে হাত দেয়াই উচিত হয়নি, রাশিয়ান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে একজন পাইলটের পক্ষে পালিয়ে আসা সম্ভব নয়। এক এক করে কত আশঙ্কাই জাগছে তাঁর মনে। ভাবছেন, শার্কের হয়তো বরফের ওপর উঠে আসার দরকারই পড়বে না। পিটি ডাভ হয়তো পৌঁছুতেই পারবে না আইস-প্যাকে।

এখন শুধু চূড়ান্ত দুঃসংবাদের জন্যে অপেক্ষা। আবার তিনি পায়চারি শুরু করলেন।

বাইশ হাজার ফিট ওপরে অন্ধকার হয়ে গেল আকাশ। গ্লাইড

করে ঘন মেঘের ভেতর নামল মিগ-৩১, কয়েকশো ফিটের বেশি দৃষ্টি চলে না। মেঘের এই বিস্তার ওপর নিচে কতটা চওড়া, রানা জানে না। প্রায় শূন্যে ছেড়ে দেয়া পাথরের মত নেমে যাচ্ছে প্লেন। এই মেঘ সাগরের পিঠ ছুঁয়ে থাকলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। টার্গেট আর চার মিনিটের পথ, প্রতি মিনিটে নিচের দিকে নামছে প্লেন সাড়ে তিন হাজার ফিট, একশো আশি নট গতি, প্রতি মিনিটে তিন মাইল এগোচ্ছে। টার্গেট লোকেশনে যখন পৌঁছুবে, সী লেভেল থেকে আট হাজার ফিট ওপরে থাকবে ও।

স্ক্রীনে কিছু নেই, টি-এফ-আর থেকে শুধু জানা যাচ্ছে ওর নিচে সাগরে বরফের মাঠ একের পর এক ভেসে যাচ্ছে। সাগরে জাহাজ আকৃতির কিছু নেই, আকাশও ফাঁকা।

পিক আপ থেকে একঘেয়ে সিগন্যাল বেরিয়ে আসছে।

আবছা অন্ধকারে বসে ঠাণ্ডায় হি হি করছে রানা।

ক্যাপ্টেন হার্বার্ট জেমসন পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজায় নক করে কেবিনের ভেতর উঁকি দিল তার প্রধান সহকারী লে. কর্নেল জন গার্ডনার। গার্ডনারের চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ছুটে এসেছে সে, হাঁপাচ্ছে। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'এয়ারক্রাফট, কন্ট্যাক্ট, স্যার—এদিকেই আসছে।'

হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। এক পা সামনে এগোল সে, 'রেঞ্জ?' ধমকের মত শোনাল তার কণ্ঠস্বর। উত্তরের জন্যে অপেক্ষায় থাকল না। ক্যাপটা মাথায় ঠিকমত বসাতে বসাতে লে. কর্নেলকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ল কেবিন থেকে।

'চার মাইলেরও কম, স্যার,' ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু হন হন করে এগোচ্ছে গার্ডনার। 'বারো হাজার ফিট ওপরে রয়েছে। শি ইজ অন দি বেয়ারিং, স্যার। আর কোন রাডার কন্ট্যাক্টও নেই শুধু অস্পষ্ট একটু ইনফ্রা-রেড। হয় একেবারে কম পাওয়ারে

রয়েছে, তা নয়তো ইঞ্জিন ব্যবহারই করছে না।'

সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে দ্রুত হাঁটছে জেমসন। তাহলে সে-ই। 'বরফের সারফেস টেমপারেচার কত?'

'এখনও কমছে, স্যার। আর দু'ডিগ্রী কমলেই পানি বরফ হতে শুরু করবে।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সহকারীর দিকে ফিরল জেমসন। 'মাত্র দু'ডিগ্রী?'

'জ্বী, স্যার।'

'বাতাস?'

'পাঁচ থেকে দশ নট, ওঠা-নামা করছে।'

'তারমানে ইনসাফিশিয়েন্ট টারবুলেন্স, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল লে. কর্নেল।

সাবমেরিনের কন্ট্রোল-রূমে ঝড়ের বেগে ঢুকল ওরা। 'কোথায় সে?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'তিন মাইল দূরে, এগারো হাজার ফিটের একটু বেশি ওপরে, স্যার!' রাডার অপারেটর বলল।

'একই বেয়ারিঙে রয়েছে এখনও?'

'স্যার।'

'বরফের মাঠটা সে দেখতে পাচ্ছে?'

'জ্বী, স্যার। মেঘ এখান থেকে সাড়ে তেরো হাজার ফিট দূরে।'

'তাহলে এসো, ভদ্রলোককে আমরা অবাক করে দিই,' গম্ভীর এক চিলতে হাসি ফুটল ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে। 'ব্লো অল ট্যাংকস–হিট ইট!'

বরফের মাঠটা ছাড়া আর কিছু দেখছে না রানা। সাগর থেকে তেরো হাজার ফিট ওপরে মেঘের নিচে নেমে এসেছে এয়ারকিং।

বরফের মাঠটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও। উত্তর-দক্ষিণে দু'মাইল লম্বা হবে ওটা, চওড়ায় একটু যদি কম হয়। সরাসরি ওর পথের সামনে রয়েছে। রাডার স্ক্রীনে কোন প্লেন নেই। অথচ টার্গেট রয়েছে মাত্র ছয় মাইলেরও কম দূরে। বরফের মাঠটাও প্রায় ওই রকম দূরে। কিন্তু রিফুয়েলিং পয়েন্ট কোথায়? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছে না ও!

এই প্রথম সাবমেরিনের কথা মনে হলো ওর। হয়তো বরফের তলায় গা ঢাকা দিয়ে আছে।

যদি ল্যান্ড করতে হয়, ওই বরফের ওপরই, বুঝে নিল রানা। সামনেটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে চোখ দুটো, কিছু নেই। প্রথমে হতাশ, তারপর আতঙ্ক বোধ করল ও। আশা করেছিল, ট্যাংকার-এয়ারক্রাফট থেকে ফুয়েল সাপ্লাই পাবে। সে-সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। রিফুয়েলিং পয়েন্ট সাবমেরিন হলে বরফের ওপর ল্যান্ড করতেই হবে ওকে। আর মরু এলাকার বরফ কি রকম হয়, জানা আছে ওর। ওপর থেকে দেখে, কেউ বলতে পারে না ওটা আসলে কি ধরনের বরফ। দেখে হয়তো মনে হবে, নিরেট, কিন্তু কয়েক ইঞ্চি নিচেই ঝুরঝুরে বরফ, পা পড়লেই দেবে যায়—এভাবে স্যাঁৎ করে নেমে গিয়ে চিরতরে অনেক লোককে হারিয়ে যেতে দেখেছে ও।

দৈত্যাকার একটা বরফ, আশপাশে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। আশপাশের টুকরোগুলো ছোট ছোট, ওটার চার ভাগের এক ভাগও নয় কোনটা।

তারপর ব্যাপারটা ঘটল। হঠাৎ বদলে গেল সিগন্যালের আওয়াজ। পিপ পিপ আওয়াজ শুরু করল পিক-আপ। প্রতি সেকেন্ডে একজোড়া শব্দ। প্রতি মুহূর্তে তীক্ষ্ণ আর তীব্র হচ্ছে সিগন্যাল। টার্গেটের আরও কাছে চলে আসছে ও। সাগরের অবস্থা আরও একবার পরীক্ষা করল ও। বাতাসের গতিবেগ পাঁচ

থেকে দশ নট, তার বেশি না। বরফে যদি নামতেই হয়, ল্যান্ড করার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে রাখল রানা।

বরফের গা মোটামুটি সমতলই বলা চলে। সম্ভাব্য রানওয়ে কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে হবে বেছে নেয়ার চেষ্টা করল। এই সময় বরফের পশ্চিম কিনারায়, এয়ারকিঙের পোর্ট সাইডে প্রথমে ফুলে উঠল, বরফের গায়ে ফাটল ধরল, তারপর ফাটলের কিনারাগুলো ভাঁজ হয়ে গেল। একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের রিইনফোর্সড সেইল উঠে এল বরফের তলা থেকে। সেইলের নিচে সাবমেরিনের আকৃতি। বরফের ছোট-বড় টুকরো, কুচি ঝরে পড়ছে গা থেকে।

সেইল থেকে কমলা রঙের বেলুন ছাড়া হলো। সুতো বাঁধা বেলুনটা খানিকদূর এগিয়ে বাতাসের চাপে কাত হয়ে স্থির থাকল।

রাডার পরীক্ষা করল। স্ক্রীন ফাঁকা। থ্রটল একটু ঠেলে দিয়ে প্লেনের নাক নিচের দিকে নামাল রানা। দুশো ষাট নট স্পীড তুলে এয়ার ব্রেক স্পর্শ করল ও।

কেরোসিন ভর্তি সাবমেরিন ওর ঠিক নিচে এখন। প্লেনের ট্যাংকে ফুয়েল ভরতে ঘণ্টাখানেকের মত লাগবে, তারপর আবার আকাশে উঠতে পারবে রানা। বরফের মাঠটাকে একবার চক্কর দিয়ে ল্যান্ড করার জন্যে তৈরি হয়ে গেল ও।

আন্ডারক্যারিজ নামাল ও, সেই সাথে তালা লেগে গেল চাকাগুলোয়। স্পীড কমিয়ে দুশো বিশে নামিয়ে আনল, সিধে করল ডানা জোড়া। বরফের মাঠ সামনে, তার গায়ে গাঁথা রয়েছে কালো চুরুট আকৃতির সাবমেরিন। অলটিচ্যুড চেক করল রানা, এক হাজার ফিট। স্পীড আরও কমিয়ে একশো আশিতে নামাল। প্রতি মিনিটে তিনশো পঞ্চাশ ফিট নামছে ও। ওপরে উঠে আসছে বরফ। থ্রটল পিছিয়ে আনল ও, স্পীড একশো পঁচাত্তর নটে

নামাল। বরফের সাদা আভা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

অনেকটা থ্রটল টানল রানা। ছেড়ে দেয়া পাথরের মত খসে পড়তে শুরু করল মিগ-৩১। বরফের গায়ে ধাক্কা খেলো চাকা। মুহূর্তের জন্যে সামনে কিছুই দেখতে পেল না রানা।

বিপদটা এল আরেক দিক থেকে। হালকা কুয়াশা ছিল, টেমপারেচার হঠাৎ কমে যাওয়ায় বরফ কুচি হয়ে গেল শিশির বিন্দু। মুহূর্তের জন্যে পরিষ্কার হয়েছিল স্ক্রীন, আবার সেটা ঝাপসা হয়ে গেল। সগর্জনে ছুটছে প্লেন। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে জানে না রানা। সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও।

সাত

কি ঘটেছে বুঝতে পারল রানা। টেমপারেচার হঠাৎ করে নেমে যাওয়ায় শিশির বিন্দুগুলো তুষার কণা হয়ে গেছে। মেরু প্রদেশে আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত নয়। নিরেট বরফের ওপর তুষার জমে আছে, তাতে বাধা পেয়ে দ্রুত কমে আসছে এয়ারকিঙের গতি। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ও, জানার উপায় নেই। ককপিট থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। উত্তর-দক্ষিণে ছুটছে প্লেন, সরাসরি সাগরের দিকে। হিসেবে যদি ভুল হয়ে থাকে, সাগর যদি আর দুশো গজ দূরে না হয়ে বিশ গজ দূরে হয়, বরফের মাঠটা যদি খুব ছোট হয়...

তুষারের পুরু আবরণের নিচে বরফের গা এবড়োখেবড়ো, গতি কমে আসায় ঝাঁকি খেতে শুরু করল প্লেন। কুয়াশা এরই মধ্যে ঘন হয়ে উঠেছে, ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, কমলা রঙের বেলুন কোথাও দেখা

গেল না। সাবমেরিনটাকে হারিয়ে ফেলেছে ও।

পোর্টের দিকে প্লেনটাকে একশো আশি ডিগ্রী ঘোরাল ও, ফিরতি পথ ধরে এগোল। এয়ারকিঙের গতি মন্থর। রানার চোখ দুটো চঞ্চল, কুয়াশার ভেতর যদি কোন ছায়ামূর্তি দেখা যায়, বা কোন আলোক সঙ্কেত।

কুয়াশা কোথাও কোথাও আবার হালকা হতে শুরু করল। খানিকটা দূরে গাঢ় রঙের কি যেন দেখল ও, মনে হলো একটা মানুষের আকৃতি, কিন্তু তারপরই হারিয়ে গেল সেটা। বোতাম টিপে ককপিটের ঢাকনি তুলে দিল ও। গরম বাতাস বেরিয়ে গেল, ভেতরে ঢুকল মেরুদেশের হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, একদল মৌমাছি যেন অ্যান্টি-জি স্যুট ফুটো করে কামড় বসাল সারা গায়ে। দাঁতের সাথে দাঁতের বাড়ি লেগে খটাখট আওয়াজ হলো। কন্ট্রোল ধরা হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। হেলমেটের তালা খুলে মাথাটাকে ভারমুক্ত করল ও। খুলিতে যেন ঠাণ্ডা আগুন ধরে গেল। দাঁতের খটাখট অগ্রাহ্য করে কান পাতল ও, কুয়াশার ভেতর কিছু নড়ছে কিনা খুঁজল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

বাঁ দিকে...হ্যাঁ, আওয়াজটা বাঁ দিক থেকেই আসছে। কানের ভুল? সরু গলা, অনেকটা পাখির ডাকের মত। তারপর মনে হলো, না, বাঁ দিক থেকে নয়, আওয়াজটা আসছে ওর পিছন থেকে। হতে পারে, ভাবল ও, সার্চ-পার্টি প্লেনের খোঁজে ওদিকে গিয়েছিল, এখন আবার ফিরে আসছে। রানা যে একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিয়ে এদিকে ফিরে এসেছে, এতক্ষণে জানতে পেরেছে ওরা।

প্রথমে চোখে পড়ল ল্যাম্পের ম্লান আলো। আলোটা কারও হাতে দুলছে। আলোর পিছনে মানুষের একটা আকৃতি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো। পিটি ডাভের নাম ধরে কে যেন ডাকছে।

সাড়া দিল না রানা। ডাকটা আবার কানে এল। উচ্চারণ আর

বাচনভঙ্গি শুনে বোঝা যায়, লোকটা আমেরিকান। পিটি ডাভকে ওরা কেউ চেনে? সামনে থেকে কখনও দেখেছে?

একটু পরই জানা যাবে।

সাড়া দিল রানা, 'এদিকে—প্লেন এদিকে।'

'আপনি...মি. পিটি ডাভ?' আমেরিকান লোকটা এত বড় এয়ারকিংকে এখনও দেখতে পায়নি। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুশি লাগল রানার, অন্তত ওই ব্যাটার চেয়ে তার চোখ ভাল।

ব্রেক ব্যবহার করার দরকার হয়নি, নরম তুষারের বাধা পেয়ে আপনাআপনি দাঁড়িয়ে পড়েছে মিগ-৩১। পার্কা পরে থাকায় চলমান একটা তাঁবুর মত দেখাল লোকটাকে। মুখের সামনে আর/টি সেট তুলে সাবমেরিনের কারও সাথে কথা বলছে। 'অ্যাই, তোমরা সবাই চলে এসো এদিকে, ভদ্রলোককে পেয়েছি আমি।'

মূর্তিটা আরও এগিয়ে এল, এতক্ষণে তার লম্বাটে, সরু মুখ দেখতে পেল রানা। পার্কা হুডের নিচে নেভী ক্যাপে সোনালি পাত রয়েছে, তারমানে এই লোকই ক্যাপ্টেন। চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল রানা। পিটি ডাভকে চেনো নাকি হে?

দস্তানা পরা হাত দিয়ে প্লেনের ফিউজিলাজে একটা চাপড় দিল ক্যাপ্টেন জেমসন। তারপর রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাই!'

জবাব না দিয়ে শুধু হাত নাড়ল রানা। কুয়াশার ভেতর আলো, লোকজন দেখা গেল, এদিকে এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ল্যাম্প, সবাই ফার দিয়ে কিনারা মোড়া পার্কা পরে আছে। তাদের মধ্যে থেকে একজন জানতে চাইল, 'ক্যাপ্টেন, এখুনি লাইন দিতে বলেন আপনি?'

ঘাড় ফিরিয়ে সহকারীদের দিকে ফিরল জেমসন। 'হ্যাঁ...পাখির বাচ্চাটাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে চলো—বেচারি তেষ্টায় মারা যাচ্ছে।' রানার দিকে ফিরল সে, নিচু গলায় বলল,

‘কংগ্রাচুলেশন্স, মি. ডাভ। আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন।’

‘আপনিও তার চেয়ে কম কিছু করেননি,’ বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন, তারপর হ্যান্ডসেটটা মুখের সামনে তুলে বলল, ‘ক্যাপ্টেন বলছি। রোল-কল। নাম্বার বলে যাও।’

নাম্বারগুলো শুনল জেমসন। আবার যখন নিস্তব্ধতা নামল, রানার দিকে ফিরল সে। ‘এই নরকে আমার অর্ধেক লোক দাঁড়িয়ে আছে, দুটো সরল রেখা ধরে, একেবারে সেই সাবমেরিন পর্যন্ত। দুই রেখার মাঝখান দিয়ে যেতে পারবেন তো?’

‘অনায়াসে।’ মনের ভাব চেপে রাখার চেষ্টা করলেও, ক্যাপ্টেনকে রানার অস্থির মনে হলো।

দ্রুত পিছিয়ে গেল ক্যাপ্টেন। ব্রেক রিলিজ করল রানা। ধীরে ধীরে সামনে এগোল এয়ারকিং। দুই রেখার মুখে প্রথম দু’জন লোককে দেখতে পেল ও, মাথার ওপর ল্যাম্প তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একে একে আরও ল্যাম্প চোখে পড়ল, ওগুলোর মাঝখানে কুয়াশার ভেতর একটা টানেল। টানেলের দিকে প্লেনের নাক সিধে করে নিল রানা। এক এক করে পিছিয়ে যেতে লাগল ল্যাম্পের আলো। ক্যাপ্টেনের উত্তেজিত গলা শুনতে পেল ও। ‘আরে, পিছনে তোমরা দাঁড়িয়ে থাকছ কি মনে করে? ছোটো! এটা আমাদের প্লেন, কামান দাগবে না!’

ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বরই বলে দেয়, আতঙ্কের মধ্যে আছে সে। লম্বা আকৃতি একটা সেইল দেখতে পেল রানা। ক্যাপ্টেন বলল, ‘ওই দেখা যায়।’

‘হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।’

‘ঠিক পাশে দাঁড় করান প্লেনটাকে। কার-এ বসে খাবেন, নাকি ভেতরে ঢুকবেন?’

চুরুট আকৃতির সাবমেরিনের পাশে, সমান্তরাল রেখায় এয়ারকিংকে দাঁড় করাল রানা। ‘জননী-১’ বরফের নিচে অর্ধেক

ডেবে আছে এখনও। ইঞ্জিন বন্ধ করল ও। অখণ্ড নিস্তব্ধতা নেমে এল। হঠাৎ করেই এয়ারকিঙের ওপর আশ্চর্য একটা স্নেহ অনুভব করল রানা। এটা শুধু একটা চুরি করা প্লেন নয়, নয় শুধু সি.আই.এ. আর জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের কেড়ে নেয়া মুখের গ্রাস–মিগ-৩১ রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসতে সাহায্য করেছে ওকে, মিসাইল-ক্রুজারকে এড়িয়ে আসতে সাহায্য করেছে...ক্যাপ্টেন জেমসনের কথায় রানার চিন্তায় বাধা পড়ল।

'নেমে পড়ুন, মি. ডাভ। সময়ের বড় অভাব।'

ককপিট থেকে নামতে গিয়ে চমকে উঠল রানা। সারা শরীরে তীব্র ব্যথা, হাড়ের জোড়াগুলো প্রতিবাদ করে উঠল। ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল ও! 'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল একবার। ককপিট থেকে নেমে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল বরফের ওপর। সত্যি সত্যি পালিয়ে আসতে পেরেছে, বিপদ কেটে গেছে, বিশ্বাস করতে পারছে না ও।

কারণ, অন্তরের অন্তস্তলে জানে ও, আসলে বিপদ কাটেনি।

'ডাকো ওদের!' গর্জে উঠলেন এয়ার মার্শাল ঝনঝেনিৎসিন। 'প্রতিটি পোলার সার্চ স্কোয়াড্রনকে রিপোর্ট করতে বলো!'

সবগুলো রিপোর্ট এসে পৌঁছুতে মূল্যবান চারটে মিনিট পেরিয়ে গেল। এই চার মিনিটে পিটি ডাভ কত দূরে সরে গেল কে জানে, ভাবলেন এয়ার মার্শাল। শেষ সার্চ-প্লেনের রিপোর্ট পাবার পর আর কোন সন্দেহ থাকল না–বরফের ওপর আমেরিকানরা কোন ফুয়েল সাপ্লাইয়ের আয়োজন করেনি, বা কোন মার্কিং-এর সাহায্যে বা অন্য কোনভাবে বরফের ওপর রানওয়ে তৈরি করারও চেষ্টা চালায়নি।

ঠাণ্ডা চোখে এয়ার মার্শালের দিকে তাকিয়ে আছেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিলেন তিনি।

'সবগুলো ইউনিটকে নর্থ কেপের দিকে যেতে বলুন।'

মাথা ঝাঁকালেন ঝনঝেনিৎসিন। 'নর্থ কেপ সেক্টরের মৌমাছি-স্কোয়াড্রনগুলোকে টেক-অফ করতে বলো।' ম্যাপের দিকে একবারও তাকালেন না, কোথায় কি আছে সব তাঁর নখদর্পণে। 'ওতোভ আর পাভোনিকে নির্দেশ দাও, কোর্স বদলে নর্থ কেপের দিকে রওনা দেবে ওরা! নির্দেশ দাও, ফুল স্পীড।'

'এয়ার মার্শাল।'

'ব্যারেন্ট সী ম্যাপে যতগুলো সাবমেরিন দেখছ, সবগুলোকে অর্ডার করো, কোর্স বদলে নর্থ কেপে যেতে হবে। টপ স্পীড।'

'এয়ার মার্শাল।'

'রিগাকে নির্দেশ দাও, এসকর্ট সহ কোর্স বদলে নর্থ কেপের দিকে যেতে হবে। রিগাকে বলো, তার হেলিকপ্টারগুলো এই মুহূর্তে টেক-অফ করুক।'

'এয়ার মার্শাল।'

তিনি ভাবলেন, এ হলো চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, সেই অবস্থা। ব্যারেন্ট সী-র পানি আর তার ওপর আকাশে যা কিছু আছে সব তিনি নর্থ কেপের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

ম্যাপে এখন ব্যারেন্ট সী-র পশ্চিম দিকটা দেখা যাচ্ছে, এয়ার মার্শালের প্রতিটি অর্ডারের সাথে সাথে টেবিলের ম্যাপ বদলে গেছে। ঝনঝেনিৎসিন অনুভব করলেন, তিনি ঘামছেন। পা দুটো হঠাৎ করে দুর্বল লাগল, মনে হলো তাঁর ভার বইতে চাইছে না। ধীরে ধীরে পিছু হটে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি, মুখ তুলে দেখলেন তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসছেন ফার্স্ট সেক্রেটারি।

'পরাজয় যদি মানতেই হয়, একদিক থেকে সেটা ভালই হবে,' ফার্স্ট সেক্রেটারি বললেন। 'আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এর আগে এরকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়নি। নিজেদের দুর্বলতা কোথায়, কি ধরনের, সব পরিষ্কার জানা যাচ্ছে, ঠিক না?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন ঝনঝেনিৎসিন। ভাবলেন, কিন্তু এই দুর্বলতার জন্যে নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে দায়ী করা হবে। একটা সবিনয় কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কমরেড বেরেনকো রিপোর্ট করছেন–পিপি-টু উপকূল পেরোচ্ছে–ইনডিগার কাছে, পঞ্চাশ ডিগ্রী লংগিচ্যুড রেখা বরাবর।'

খবরটা নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল পড়ার মত। মিগ-৩১-এর প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পর্কে সবাই যেন নতুন করে সচেতন হয়ে উঠল। বেরেনকো টেক-অফ করেছে মাত্র পঁচিশ মিনিট হয়েছে, আর বিলিয়ারস্ক থেকে উপকূল উত্তর দিকে বারোশো পঞ্চাশ মাইল দূরে। বিশ্বাসই করা যায় না। এত তাড়াতাড়ি উপকূল পেরিয়ে ট্যাংকার-এয়ারক্রাফটের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে ব্যারেন্ট সী-র ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে পিপি-টু।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে ঝনঝেনিৎসিন জানতে চাইলেন, 'বেরেনকোকে কোর্স বদলাতে বলব, ফার্স্ট সেক্রেটারি?' তাঁকে ক্লান্ত দেখাল।

মাথা নাড়লেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, মৃদু হাসিটুকু এখনও লেগে আছে ঠোঁটে। 'এখুনি নয়, আগে ট্যাংকারের সাথে দেখা হোক তার, পিপি-ওয়ান কোথায় জানি, তখন বললেই তীরের মত পিছু নেবে।'

ল্যান্ড করার বিশ মিনিট পর সাবমেরিন থেকে বরফে বেরিয়ে এল রানা, রিফুয়েলিঙের কাজ কি রকম এগোচ্ছে দেখতে চায়। বেরিয়ে আসার সাথে সাথে আবার দু'সারি দাঁত খটাখট আওয়াজ শুরু করে দিল। বাতাসের বেগ বেড়েছে, ঘন মেঘের মত কুয়াশা হালকা হতে শুরু করেছে। এয়ারকিঙের পাশে দাঁড়িয়ে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল রানা। ধার করা একটা পার্কা পরেছে ও, দাঁড়িয়ে আছে কুঁজো হয়ে, হাত দুটো পকেটে। সাবমেরিনের

ক্রুরা খাটছে, রিফুয়েলিঙের কাজে ঝামেলা কম নয়।

ক্যাপ্টেন জেমসনের সাথে দু'মিনিট আলাপ করেই বুঝে নিয়েছে রানা, পিটি ডাভকে ওরা কেউ কখনও দেখেনি, এমন কি তার একটা ফটো পর্যন্ত পায়নি।

দুটো হোস, প্রতিটি ডায়ামিটারে চার ইঞ্চি, বরফের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে প্লেনের দিকে এগিয়ে এসেছে। ঠেলে নিয়ে আসা হয়েছে একটা ট্রলি-পাম্প, সাবমেরিনের ফরওয়ার্ড হ্যাচ থেকে উইঞ্চের সাহায্যে নামানো হয়েছে ওটাকে। ছোট আরও একটা হ্যাচের মুখ খোলা হয়েছে, সেটা ফরওয়ার্ড ডেকে। ওদিক থেকে তেলের গন্ধ ভেসে এল রানার নাকে। ফরওয়ার্ড ক্রু কোয়ার্টারের ওপরের হ্যাচের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে একটা হেভী-ডিউটি হোস।

রিফুয়েলের কাজ শেষ হতে আরও বিশ মিনিট লাগবে, জানে রানা। এয়ারবেসে যে-ধরনের প্রেশার-পাম্প থাকে তার সাহায্যে একটা যুদ্ধবিমানে প্রতি মিনিটে তিন হাজার গ্যালন ফুয়েল ভরা যায়, আর এখানে যে ট্রলি-পাম্পটা রয়েছে সেটা মান্ধাতা আমলের, একটু একটু করে দম ফেলে।

কাজের শুরুতেই বাধা পড়েছিল, রানা তখন সাবমেরিনে বসে হালকা নাস্তা সারছে। ট্রলি-পাম্পটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, কয়েক জায়গায় ওয়্যারিং ঢিলে হয়ে আছে। তারপর দেখা গেল, বন্ডিং ওয়্যার লম্বায় অনেক ছোট। সব ঠিকঠাক করে নিয়ে কাজ শুরু করতে বেরিয়ে গেছে মূল্যবান বিশটা মিনিট।

ইউ.এস.এস. শার্কে দু'জন সিভিলিয়ান রয়েছে, একজন ইঞ্জিনিয়ার, অপরজন ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট। রিফুয়েলিঙের কাজ তদারক করছে তারা। তাদের আশ্বাস পেয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনে ফিরে এল রানা।

খোশ-গল্প করার মেজাজ নেই কারও, কাজেই চুপচাপ বসে থাকল দু'জন। রানা শুধু এক সময় বলল, 'দশ মিনিট।'

'জ্বী।'

'দশ মিনিটের মধ্যে রিফুয়েলিঙের কাজ শেষ হবে তো?' জানতে চাইল রানা।

কোনরকম নিশ্চয়তাও দিল না ক্যাপ্টেন, আবার রানাকে হতাশও করল না, শুধু কাঁধ ঝাঁকাল। এই সময় নক হলো দরজায়। কেবিনে উঁকি দিল লে. কর্নেল জন গার্ডনার। ক্যাপ্টেনকে বলল, 'ওয়েদার রিপোর্ট, স্যার।'

গার্ডনারের গলার সুরে এমন একটা কিছু ছিল, সটান উঠে দাঁড়াল রানা। 'কি হয়েছে?'

'বাতাসের বেগ বাড়ছে, স্যার,' রানার দিকে নয়, ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে গার্ডনার। 'প্রায়ই পনেরো নট পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে।'

ক্যাপ্টেন মাথা ঝাঁকাল। শান্ত হলো রানা। পনেরো নট বাতাসে টেক-অফ করা তেমন বিপজ্জনক নয়।

'কাজ কতদূর?' জানতে চাইল জেমসন।

'প্রায় হয়ে এসেছে, স্যার—আর সাত কি আট মিনিট লাগবে, হাডসন তো তাই বলল।'

আবার মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। শার্কের চীফ ইঞ্জিনিয়ার হাডসন, তার হিসেবে ভুল হতে পারে না।

দরজা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল গার্ডনার। আবার বসতে যাবে রানা, প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে টেবিলের ওপর দিয়ে উড়ে এসে পড়ল বাল্কহেডের গায়ে। পলকের জন্যে জেমসনকে দেখতে পেল ও, বাঙ্ক থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে। দু'বার দপদপ করে উঠে নিভে গেল সাবমেরিনের আলো, তারপর আবার ফিরে এল। কাঁধ সহ শরীরের একটা অংশ প্রায় অবশ হয়ে গেছে রানার, ডেক

থেকে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করল ওর বুকের ওপর পদ্মাসনে বসে আছে ক্যাপ্টেন। খোলা দরজা দিয়ে একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে, কম্প্যানিয়নওয়েতে আছাড় খেয়ে আর উঠতে পারছে না গার্ডনার। রানার বুক থেকে নামল ক্যাপ্টেন জেমসন, রানাও উঠে বসল।

'কি?' ব্যথায় চোখ-মুখ কুঁচকে আছে রানার।

ঠোঁটের কোণ কেটে রক্ত বেরুচ্ছে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সেটুকু মুছে নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল জেমসন। বাইরে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। টলতে টলতে দরজার দিকে এগোল সে। হুঙ্কার ছেড়ে জানতে চাইল, 'কি ঘটছে কি, সেইলর?'

দাঁড়াতে পারল রানা, কিন্তু হাঁটতে গিয়ে টের পেল, গোড়ালি মচকে গেছে, খোঁড়াচ্ছে একটু একটু। এক হাত দিয়ে বাঁ কাঁধটা ডলছে, অবশ ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তবু ভাল যে কোন হাড় ভাঙেনি বা অন্য কোনদিকে সরে যায়নি।

'স্যার...আমরা জানি না!'

'কি? জানো না? তাহলে তোমরা আছ কি করতে? জানো না —জানো!'

'স্যার!' কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ফিরতি পথে আবার ছুটল নাবিক।

'এয়ারকিং...'

রানার কথা শেষ না হতেই জেমসন বলল, 'রাখুন আপনার এয়ারকিং! আমি আমার বোটের কথা ভাবছি।'

জেমসনের পিছু পিছু কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা। বাল্কহেডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গার্ডনার, তার কপাল কেটে রক্ত গড়াচ্ছে। তার দিকে একবারও না তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে এগোল ক্যাপ্টেন। একবার থেমে গার্ডনারের ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা, সেটা তেমন মারাত্মক নয় দেখে লে. কর্নেলের পিঠ

চাপড়ে দিয়ে ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু ঢুকে পড়ল কন্ট্রোল রূমে।

কন্ট্রোল রূমে এখনও সবাই উঠে বসতে বা দাঁড়াতে পারেনি। উল্টে পড়া ফার্নিচার তুলছে কয়েকজন। হ্যাচ ল্যাডার ধরে ব্রিজে উঠে এল রানা।

'ড্যামেজ রিপোর্ট দাও আমাকে, জলদি!' ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে লাল আঙুলটা চোখের সামনে ধরল ক্যাপ্টেন।

হিম বাতাস পরনের পার্কা ভেদ করে গায়ে হুল ফোটাচ্ছে। সেইলের মাথা থেকে এয়ারকিংকে দেখা গেল। দেখে মনে হলো প্লেনের কোন ক্ষতি হয়নি। রিফুয়েলিঙের কাজে যারা ব্যস্ত ছিল তারা সবাই এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, দু'একজন এখনও বরফ থেকে উঠে দাঁড়াতে পারেনি। চিৎকার করে একজন নাবিকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল রানা, লোকটা এয়ারকিঙের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'ওহে, কি হয়েছে জানো কিছু?'

মুখ তুলে এদিকে তাকাল লোকটা, রানার পাশে ক্যাপ্টেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। 'ঠিক বলতে পারব না, স্যার–বিদঘুটে একটা শব্দ শুনলাম, তারপর দেখি বরফের ওপর পড়ে আছি। মনে হলো বোটে বোধহয় মাছ ঢুকেছে...'

'বেকুব?' গাল পাড়ল ক্যাপ্টেন। 'কোত্থেকে আসবে টর্পেডো? হাডসন কোথায়!'

'ওদিকে গেছেন, স্যার।' লোকটা হাত তুলে ভাসমান বরফের উত্তর দিকটা দেখাল।

উত্তর দিকে এখনও কুয়াশা রয়েছে, তবে হালকা। কিন্তু দেড়শো ফিটের বেশি দৃষ্টি চলে না। কি হয়েছে জানার জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে, রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ওরা দু'জনেই একটা ব্যাপার লক্ষ করল, সময়ের সাথে সাথে বাতাসের বেগ আরও বাড়ছে। চোখে-মুখে ঝাপটা লাগায় দু'জনেরই চোখ ছলছলে হয়ে উঠল।

ভয় হচ্ছে রানার। বিপদটা কি হতে পারে আঁচ করতে পারছে ও। বাতাসের বেগ বাড়ছে সেটা তেমন বিপদ হয়ে দেখা নাও দিতে পারে। কিন্তু ভাসমান বরফের মাঠ যদি গলতে শুরু করে বা বরফের গায়ে কোথাও যদি ফাটল দেখা দেয় অথবা বরফ যদি চাপ খেয়ে ফুলে ওঠে...

কুয়াশার ভেতর হাডসনকে দেখা গেল। অস্পষ্ট, মন্থর গতি একটা ছায়ামূর্তি। তাকে লক্ষ্য করে ছুটল রানা। 'কি হয়েছে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল ও। চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পথ আগলে তার কাঁধ খামচে ধরল। 'বলুন কি হয়েছে!'

শান্তচোখে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে এক সেকেন্ড চুপ করে থাকল চীফ ইঞ্জিনিয়ার, তারপর মৃদু গলায় বলল, 'প্রেশার রিজ!' রানা যা আশঙ্কা করেছিল তাই। 'বরফের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত।'

হতাশায় কালো হয়ে গেল রানার চেহারা, বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে ঘুসি মারল ও। 'কত চওড়া?'

'তিন কি চার ফিট...'

'কোথায়...চলুন আমাকে দেখাবেন!' হাডসনের কব্জি ধরে টান দিল রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ডদেহী চীফ ইঞ্জিনিয়ার অনুসরণ করল ওকে। ওদের পিছু নিল হতভম্ব জেমসন।

দু'পাশের প্রচণ্ড চাপে ভাসমান বরফের মাঝখানটা ফুলে উঠেছে—প্রেশার রিজ। প্রায় চার ফিট উঁচু ওটা, সাগর থেকে উঠে এসে নিচু পাঁচিলের মত বরফের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে সোজা চলে গেছে দৃষ্টি সীমার বাইরে।

'ঠিক জানো এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত গেছে?' জিজ্ঞেস করল জেমসন।

'হ্যাঁ, দু'দিকেই আমি অনেক দূর পর্যন্ত গেছি।'

টেক-অফ করার জন্যে প্রেশার রিজ কি রকম বাধা হয়ে

দাঁড়াতে পারে, চীফ ইঞ্জিনিয়ার তা বোঝে, সেজন্যেই বাতাস উপেক্ষা করে যতদূর সম্ভব দু'দিকটা দেখে এসেছে সে, তার কথা অবিশ্বাস করা যায় না।

আতঙ্কিত বোধ করল রানা। 'ঘটল কিভাবে ?' অস্ফুটে জানতে চাইল ও।

'দমকা বাতাস,' হাডসন বলল। 'বরফের ছোট একটা মাঠকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে বাতাস, আমাদের মাঠের সাথে ধাক্কা খেয়েছে—দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের মত। ফলাফল, এই প্রেশার রিজ।'

হাডসনের আস্তিন চেপে ধরল রানা। 'এর অর্থ আপনি বোঝেন? আমি টেক-অফ করতে পারব না! মিগ-৩১ এখানে আটকা পড়ে গেল!'

'বেরেনকো? আমি ঝনঝেনিৎসিন,' কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন এয়ার মার্শাল। সময় বাঁচাবার জন্যে কোড ব্যবহার করছেন না তিনি, তবে পাইলটের নাম ছাড়া নিজের বা প্লেনের সম্পূর্ণ পরিচয়ও প্রকাশ করছেন না।

এই মুহূর্তে বেরেনকো, মিকোয়ান মিগ-৩১ প্রজেক্টের দ্বিতীয় পাইলট, মাটি থেকে পঞ্চাশ হাজার ফিট ওপরে রয়েছে, তার পিপি-টু-র নোজ প্রোব ঢুকে রয়েছে একটা রিফুয়েলিং প্লেনের ভেতর।

কনসোল স্পীকার থেকে জট পাকানো শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে এল। অস্পষ্টভাবে শোনা গেল, 'বেরেনকো—ওভার।'

'বেরেনকোকে ঝনঝেনিৎসিন। রিফুয়েলিং শেষ হবার সাথে সাথে নর্থ কেপের দিকে যেতে হবে তোমাকে।'

পাইলট হতভম্ব হয়ে পড়ল। হঠাৎ করে প্ল্যান বদল হলো কেন! 'নর্থ কেপ? কিন্তু...'

'হ্যাঁ, নর্থ কেপ! যা বলছি শোনো! দুটো ইউনিটের সাথে রেডিও যোগাযোগ করো–মিসাইল ক্রুজার রিগা, আর গ্রাউন্ড কন্ট্রোল মৌমাছি মারমানস্ক। কপি করছ?'

কিছুক্ষণ পর জবাব এল। 'বেরেনকো–হ্যাঁ, কপি করেছি। নর্থ কেপের দিকে যাব, যোগাযোগ করব রিগা আর গ্রাউন্ড কন্ট্রোল মারমানস্কের সাথে। ওভার।'

'ধন্যবাদ। পরবর্তী নির্দেশের জন্যে তৈরি থাকো। ওভার অ্যান্ড আউট।' আঙুলের বাড়ি দিয়ে সুইচ অফ করলেন ঝনঝেনিৎসিন, ট্র্যান্সমিটারের দিকে পিছন ফিরলেন। আমেরিকানরা ওদের দু'জনের কথাবার্তা নির্ঘাত শুনতে পাবে, ভাবলেন তিনি–পাক, তাতে কিছু এসে যায় না। নর্থ কেপের দিকে তিনি শুধু আরও একটা ইউনিটকে যেতে বলেছেন।

ফার্স্ট সেক্রেটারির দিকে তাকালেন এয়ার মার্শাল। ফার্স্ট সেক্রেটারি যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল বাকুনিনের কানে কানে কি যেন বলছেন। পায়চারি শুরু করলেন ঝনঝেনিৎসিন। পিটি ডাভের রিফুয়েলিং পয়েন্ট সম্পর্কে তাঁদের প্রতিটি ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। ওই এলাকায় কোন ট্যাংকার-প্লেন নেই। রাডারে কোন সাবমেরিনও ধরা পড়েনি।

অথচ রিফুয়েলিং ছাড়া বাঁচার কোন আশা নেই পিটি ডাভের।

কেন যেন মনে হচ্ছে এই রহস্যের সমাধান তাঁর জানা আছে, কিন্তু সমাধানটা পেটে আছে, মুখে আসছে না। সম্ভাব্য আর একটা উপায়ে ফুয়েল সাপ্লাই পেতে পারে পিটি ডাভ...কি সেটা? মনে পড়ছে না কেন?

বরফের মাঠ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ওরা। চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কথাই ঠিক, চার ফিট উঁচু পাঁচিলটা পুব মাথা থেকে পশ্চিম মাথা পর্যন্ত লম্বা। মাঠের ঠিক মাঝখানে গজিয়েছে ওটা, তার মানে এয়ারকিং

যে অংশটাকে রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করবে তারও ঠিক মাঝখানে। ওই পাঁচিল থাকলে মিগ-৩১ নিয়ে টেক-অফ করা রানার পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। বরফের মাঠে সত্যি সত্যি আটকা পড়ে গেছে ও।

'এতে কাজ হবে, স্যার,' আবার বলল হাডসন। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে সে, রোগা-পাতলা জেমসনের চেয়ে অনেক লম্বা দেখাল তাকে।

লে. কর্নেল জন গার্ডনার এ-ধরনের পরিস্থিতির সাথে তেমন পরিচিত নয়, কাজেই চুপ করে থাকল সে। হাডসনের সহকারী, সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার ফেয়ারম্যান সময় আর শ্রমের হিসেব উল্লেখ করে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য সমর্থন করল। রানার সাথে ওরা পাঁচজন হিম বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে এখনও কুয়াশা রয়েছে, বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। দমকা বাতাস এখনও আসছে, তবে গতিবেগ একটু যেন কমেছে বলে মনে হলো।

'কিন্তু, জ্যাক,' হাডসনকে বলল জেমসন, ' আমাদের সাথে কি অত কোদাল আর শাবল আছে?' রানার দিকে তাকাল সে, লক্ষ করল ওদের আলোচনার দিকে মন নেই পাইলটের, গভীর মনোযোগের সাথে চারদিকের বরফ দেখছে।

'স্যার,' জবাবে বলল চীফ ইঞ্জিনিয়ার, 'শাবল, কোদাল, হেভী স্ক্রু-ড্রাইভার সবই আছে আমাদের। দরকার হলে নাহয় খুদে দু'একটা বিস্ফোরণও ঘটানো যাবে। আপনি কি বলেন?'

'জ্যাক, তোমার কি মাথা খারাপ হলো!' আঁতকে উঠল ক্যাপ্টেন।

'না, স্যার। ঠিকমত বসাতে পারলে বরফের তাতে কোন ক্ষতি হবে না।'

'প্লেনের হুইল-ট্র্যাক কতটা চওড়া, মি. ডাভ?' জানতে চাইল

জেমসন।

‘বাইশ ফিট।’

‘ঠিক জানেন?’

রিজের দিকে চোখ রেখে রানা শুধু ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। বুট পরা পা দিয়ে রিজের গায়ে লাথি মারল একটা। আলগা কিছু তুষার খসে পড়ল, সাদা হয়ে গেল বুটের ডগা, কিন্তু রিজের গায়ে কোন দাগ পড়ল না।

‘কতটা দরকার আপনার–পাঁচিলের কতটা ভেঙে দিলে আপনার চলে?’ জিজ্ঞেস করল চীফ ইঞ্জিনিয়ার।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। ‘ত্রিশ ফিট।’

‘বেশ। আপনি তাহলে জায়গাটা দেখিয়ে দিন, ঠিক কোথায় ভাঙতে হবে পাঁচিল। আপনার হয়ে ওরাই করে দেবে কাজটা।’

খোঁচাটা নিঃশব্দে হজম করল রানা। ধীর পায়ে এগোল ও, বাকি পাঁচজন বাতাসের দিকে ঝুঁকে পিছু নিল। এক জায়গায় থামল রানা, বলল, ‘এখানে।’ কোমর সমান উঁচু পাঁচিলের মাথায় একটা লাথি কষাল ও। পাঁচিলের মাথা সামান্য একটু খসল মাত্র।

পার্কার পকেট থেকে অ্যারোসল ক্যান বের করল হাডসন, স্প্রে করল বরফের গায়ে। অ্যালকোহল-বেসড তরল ডি-আইসিং পড়ায় থেঁতলানো পাঁচিলের মাথা কয়েক ইঞ্চি দেবে গেল। গুনে গুনে ত্রিশ ফিট এগোল রানা, হাডসন এসে জায়গাটা চিহ্নিত করার অপেক্ষায় থাকল।

জেমসন আন্দাজ করল, রিজের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, মধ্য-মাঠের কাছাকাছি। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘতম বিস্ত তিটা বেছে নিয়েছে রানা। হাডসনের দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন। ‘কতক্ষণ লাগবে?’

‘এক ঘণ্টা, স্যার–স্প্রেইং-ডাউনের কাজটাও তার মধ্যে সারা যাবে।’

এক ঘণ্টা খুব বেশি হয়ে যায়, প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হলো রানার। কিন্তু জানে, লাভ নেই। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে ও, শুধু এয়ারকিঙের কথা ভাবছে না, ওকে সাহায্য করতে আসা সাবমেরিন আর তার ক্রুদের কথাও ভাবছে। পাঁচিল ভাঙতে এক ঘণ্টা লাগবে, তারমানে সাবমেরিনকেও বরফের ওপর ওই এক ঘণ্টা থাকতে হবে। বিপদ যে কোন্ দিক থেকে কখন আসবে, কেউ বলতে পারে না। রাশিয়ানরা যদি ওদের অস্তিত্ব একবার টের পায়, বিপদ হবে, অথচ সাবমেরিনে কোদাল আর শাবল ছাড়া কোন অস্ত্র নেই। 'আপনি, ক্যাপ্টেন, আপনার লোকজনদের সাবধান করে দেবেন না?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল ও।

'ধন্যবাদ,' গম্ভীর ক্যাপ্টেন জেমসন। 'কিন্তু আমার কাজ আমি ভালই বুঝি, মনে না করিয়ে দিলেও চলত।'

লোকটা ওর ওপর চটে আছে, সেটা আগেই টের পেয়েছে রানা। ভাল একজন ক্যাপ্টেন সবসময় নিজের ক্রুদের নিরাপত্তার কথাই আগে চিন্তা করে। রানার জন্যে সবাই বিপদে পড়ে গেছে, কাজেই ওর ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, ভাবল রানা, এর জন্যে আমি দায়ী নই। মিগ-৩১ চুরি করার ষড়যন্ত্র তোমাদের সি.আই.এ-র। রবার্ট মরগ্যান কলকাঠি নাড়াতেই তোমাদেরকে এখানে আসতে হয়েছে।

পকেট থেকে হ্যান্ডসেটটা বের করল জেমসন, বোতাম টিপে বলল, 'বুশ? সাবমেরিনের অ্যাড্রেস সিস্টেমের সাথে কানেকশন দাও।'

যোগাযোগ হলো, ক্রুদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে শুরু করল ক্যাপ্টেন, 'ক্যাপ্টেন বলছি,মন দিয়ে শোনো সবাই। প্রেশার রিজ ভেঙে ফেলতে এক ঘণ্টা লাগবে, তারমানে সাবমেরিন নিয়ে আমরাও বরফের ওপর এক ঘণ্টা থাকছি। সবাই চোখ-কান খোলা রাখুক, এই আমি চাই। বরফের ওপর, বরফের নিচে আর

আকাশে যদি কিছু আসে, সাথে সাথে সেটাকে দেখতে পেতে হবে। একটা কিছু এল, অথচ তোমরা সেটাকে দেখতে পেলে না, এর অর্থ হবে আমাদের সবার মৃত্যু।'

বিরতি নিল জেমসন, তারপর আবার শুরু করল, 'তোমরা যারা প্লেনে কাজ করছ যত তাড়াতাড়ি পারো শেষ করো তোমাদের কাজ। রিফুয়েলিং ছাড়াও আরও কাজ আছে তোমাদের। মুহূর্তের নোটিশে যাতে প্লেন নিয়ে আকাশে উঠতে পারে পাইলট তার জন্যে যা যা করা দরকার সব করে রাখবে তোমরা। প্লেনের গায়ে তুষার থাকলে সরিয়ে ফেলবে।'

খানিক বিরতি, তারপর আবার, 'রিজ ভাঙার জন্যে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হাডসন কিছু লোককে নিয়ে কাজ করবে, তার দলে কে কে স্বেচ্ছাসেবক হতে পারবে সে-ই জানাবে তোমাদের। যন্ত্রপাতি কি কি দরকার, তাও তার কাছ থেকে জানতে পারবে তোমরা। একটু অপেক্ষা করো, তার আগে ডাক্তারের সাথে কথা বলে নিই আমি।'

'ইয়েস, স্কিপার?' ডাক্তারের গলা ভেসে এল।

'কে কি রকম জখম হয়েছে?' জানতে চাইল জেমসন।

'ফিলবি-র মাথা ফেটে গেছে, তবে মারাত্মক কিছু না, মাত্র একটা সেলাই পড়েছে খুলির চামড়ায়। আর কটউড তার নিচের পাটির দুটো দাঁত হারিয়েছে। কমবেশি প্রায় সবাই এক-আধটু আহত হয়েছে বটে, তবে শুধু এরা দু'জনই...'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার। ফিলবিকে বলো, এই ধাক্কায় ওর মাথা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে, আর কটউডের চেহারা নির্ঘাত আরও সুন্দর দেখাবে! ঠিক আছে, চীফ ইঞ্জিনিয়ার হাডসন কথা বলবে এবার। তার কথা মন দিয়ে শোনো সবাই। ধন্যবাদ।'

বোতাম টিপে নিজের হ্যান্ডসেট পকেটে ভরল ক্যাপ্টেন। রানার পাশে এসে দাঁড়াল সে। এক মুহূর্ত পাইলটের মুখের দিকে

নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর সংক্ষেপে জানতে চাইল, 'ঠিক জানেন তো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দুশ্চিন্তা করবেন না, ত্রিশ ফিট যথেষ্ট।'

'কুয়াশা কিন্তু এখনও রয়েছে।'

'বাড়লেও অসুবিধে হবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল জেমসন। 'আমার কি, মরলে আপনি মরবেন।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল, তারপর রানা বলল, 'এই এক ঘণ্টার জন্যে ধন্যবাদ, মি. জেমসন।'

অপ্রতিভ বোধ করল জেমসন। মনে মনে রানাকে দায়ী করলেও, জানে সত্যি সত্যি রানা দায়ী নয়, প্রকৃতির খামখেয়ালীর ওপর কারও কোন হাত নেই। বলল, 'আর কারও জন্যে এতবড় ঝুঁকি আমি নিতাম না, মি. ডাভ।'

'আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি,' বলল রানা। 'আপনাদের সাহায্য ছাড়া কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

বিনয়ের অবতার, তিক্ত মনে ভাবল জেমসন।

'যাই, প্লেনটাকে একবার দেখে আসি,' বলল রানা।

'ঠিক আছে।'

সাবমেরিন আর এয়ারকিঙের কাছে ফিরে এল রানা। সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে এল একদল ক্রু, ওকে পাশ কাটিয়ে কুয়াশার ভেতর দিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল, তাদেরকে ঘিরে আছে তাদেরই সাদা নিঃশ্বাস। চীফ ইঞ্জিনিয়ার কাজের লোক, ভাবল রানা, ওর ওপর ভরসা করা যায়।

পরামর্শটা রানাই দিয়েছিল ওদেরকে। রিজের একটা অংশ ভাঙা, তারপর ভাঙা জায়গাটুকু সমতল করা। প্রথম কাজটায় শাবল কোদাল আর গায়ের জোর লাগবে, দ্বিতীয় কাজে লাগবে সুপারহিটের স্টীম, যার সাহায্যে সাবমেরিনের টারবাইন চালানো হয়–প্রেশার হোস দিয়ে বরফের গায়ে স্প্রে করতে হবে।

এয়ারকিঙের গা থেকে তুষার পরিষ্কার করা হচ্ছে। প্লেনের পাশে দশ ফুটি একটা ইকুইপমেন্ট রয়েছে, দেখতে অনেকটা গার্ডেন-স্প্রের মত, ওটা থেকে একটা হোস বেরিয়ে এসে ঢুকেছে সাবমেরিনের সেইলে রাখা একটা ট্যাংকে। ছোট একটা ইলেকট্রিক মটরের সাহায্যে প্লেনের গায়ে পাম্প করা হচ্ছে অ্যালকোহল-বেসড তরল অ্যান্টি-আইসিং মিক্সচার। প্লেনের ডানা আর ফিউজিলাজকে সম্পূর্ণ বরফমুক্ত করেছে এই তরল পদার্থ। স্প্রেয়ার অপারেট করছে চারজন ক্রু, দু'জন হোস টেনে নিয়ে গেছে আন্ডার ক্যারিজে, অপর দু'জন হোসের দুটো মুখ বগলের নিচে আটকে নিয়ে যেখানে যেখানে দরকার স্প্রে করছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে প্লেনটাকে দেখল রানা, ওটা যেন ওকে জাদু করেছে। এর আগে বাইরের চেহারা ভাল করে দেখার সুযোগ হয়নি। দু'চোখ দিয়ে গিলছে যেন ও। সরু কোমরের মত ফিউজিলাজ, প্রচুর জায়গা দখল করে রাখা ভারী ইঞ্জিনগুলোর সামনে ফুলে থাকা এয়ার-ইনটেকস– ইনটারসেপটর-অ্যাটাক প্লেনে এর চেয়ে বড় আকারের এয়ার-ইনটেকসের কথা ভাবা যায় না–অসম্ভব ছোট আর মোটা ডানা, ডানার নিচে ঝুলে থাকা অ্যাডভান্সড্ অ্যানাব মিসাইল...হঠাৎ মনে হলো, সুন্দরী নারীর সাথে কোথায় যেন মিল আছে এয়ারকিঙের। কে যেন বলেছিল, সব সুন্দর শিল্পকর্মের ভেতরই যৌনাবেদন থাকে, অন্তত এয়ারকিঙের বেলায় কথাটা মিথ্যে নয়। খুঁজলে মিগ-৩১-এর আকার আকৃতির মধ্যে নারীদেহের বিভিন্ন অংশের আদল পাওয়া যাবে। রূপকথায় যেমন থাকে, দৈত্যদের আস্তানা থেকে রাজকন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে এল রাজপুত্র, ওর অভিযানও তার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। কিন্তু যত যৌনাবেদনই থাকুক, নিষ্প্রাণ একটা মেশিন বৈ তো নয়, ওর মনের কথা ওটা বুঝবে না। যন্ত্রের সাথে প্রেম হয় না।

প্রেম।

নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল, চট করে সেটা চেপে মুচকি হাসল রানা। ওর পেশায় যে ঝুঁকি, তাতে প্রেম করা চলে, কিন্তু ঘর-সংসার চলে না। তাছাড়া, বন্ধনহীন জীবনের প্রতি ওর রয়েছে দুর্নিবার আকর্ষণ। সোহানাকে ভালবাসে ও, সোহানা যদি তেমন করে চেপে ধরে হয়তো তাকে বিয়েও করে ফেলবে, কিন্তু সোহানার আত্মমর্যাদা বোধ আর অভিমান বড্ড বেশি, রানার মন বুঝতে পারার পর বিয়ের জন্যে কোনদিনই চাপ দেয়নি, দেবেও না কখনও। সেজন্যেই আরও বেশি করে ভাল লাগে তাকে ওর।

ভাগ্যবান পুরুষ, প্রেম তো জীবনে কম আসেনি। কত মেয়ে ওর পথ চেয়ে এখনও বসে আছে। জানে, রানাকে বাঁধতে পারবে না, তবু যৌবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওর জন্যে অপেক্ষা করবে কেউ কেউ।

রেবেকার কথা মনে পড়ল। ওই একটা মেয়ে, শুধু ওই একজন। ওকে প্রায় বেঁধে ফেলেছিল। আশ্চর্য এক মেয়ে! নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ওর পাশে।

মাটির সাথে মিশে মাটি হয়ে গেছে, তবু তাকে পেতে ইচ্ছে করে। মনের ভেতর থেকে ডাক অনুভব করল রানা—চলো, জিম্বাবুই চলো।

মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগে রেবেকা বলেছিল, তোমার আগে আমি যদি মারা যাই, আর তখন যদি খুব বেশি করে আমার কথা মনে পড়ে তোমার, আমাকে যদি পেতে ইচ্ছে করে, ছুঁতে ইচ্ছে করে, জিম্বাবুইয়ে চলে যেয়ো। আমার কৈশোর আর যৌবনের কিছুটা সময় ওখানে কেটেছে। ওখানে আমাদের বিশাল সম্পত্তি আছে, বাড়ি আছে, আমার নিজের হাতে সাজানো...ওখানে তুমি আমার গন্ধ, আমার স্পর্শ পাবে, আমাকেও পাবে...।

যাব, আমি যাব... ।

দুটো আঁচড়ের দাগ দেখে বাস্তবে ফিরে এল রানা । চারটে অ্যানাব মিসাইলের মধ্যে দুটো ছুঁড়েছিল ও–একটা ব্যাজারকে ফেলার জন্যে, অপরটা মিসাইল ক্রুজার রিগাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে। বাকি আর দুটো থাকার কথা । কিন্তু চারটে রয়েছে দেখেও আশ্চর্য হলো না ও ।

এই অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে সি.আই.এ. কাঠখড় কম পোড়ায়নি । সিরিয়ানদের কাছ থেকে একটা মিগ-২৫ কেড়ে আনার ব্যবস্থা করেছিল তারা । সেটা থেকে দুটো অ্যানাব মিসাইল জোগাড় হয়েছে। রবার্ট মরগ্যানের নির্দেশে মিসাইল দুটো ডেলিভারি দেয়ার জন্যে সাথে করে নিয়ে এসেছে সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন জেমসন ।

রিফুয়েলিঙের কাজ শেষ হলো । ক্রু যারা এই কাজে ছিল, তাড়াহুড়ো করে রওনা দিল রিজের দিকে, রিজ ভাঙতে সাহায্য করবে এবার ।

মিগ-৩১-কে পিছনে ফেলে হাঁটতে শুরু করল রানা । প্রায় আধঘণ্টা পর দক্ষিণ প্রান্তে চলে এল ও । তারপর উত্তর দিকে এগোল । রানওয়ে হিসেবে এই উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃতিটুকু ব্যবহার করবে ও । দুটো ভাসমান বরফের সংঘর্ষে রানওয়ের কোন ক্ষতি হয়নি, শুধু ওই একটাই প্রেশার রিজ মাথাচাড়া দিয়েছে । বরফের উত্তর প্রান্ত থেকে ফিরছে ও, গার্ডনারের গছিয়ে দেয়া হ্যান্ডসেটটা পকেটের ভেতর পিপ পিপ করে উঠল ।

'ইয়েস?'

'মি. ডাভ?' কঠিন শোনাল ক্যাপ্টেন জেমসনের কণ্ঠস্বর । 'আপনি যে পথ ধরে এখানে এসেছেন, ওদিকে তিনটে সোনার কন্ট্যাক্ট । এর মানে বোঝেন?'

কয়েক সেকেন্ড মুখে কথা যোগাল না, তারপর নিচু গলায় বলল রানা, 'হ্যাঁ। মিসাইল ক্রুজার আর তার দুটো এসকর্ট—হান্টার-কিলার সাব।'

'এর জন্যে আপনি দায়ী,' সরাসরি রানাকে অভিযুক্ত করল ক্যাপ্টেন। 'আপনিই ওদেরকে পথ দেখিয়ে এনেছেন।'

এক সেকেন্ড পর জানতে চাইল রানা, 'এখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে ওদের?'

'চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'তাহলে চিন্তার কিছু নেই,' বলল রানা। 'যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।'

'আশ্চর্য! শুধু নিজের নিরাপত্তার কথাটা ভাবছেন? আমার ক্রুদের কি হবে, যারা আপনাকে পালানোর সুযোগ করে দেয়ার জন্যে জান-জীবন দিয়ে রানওয়ে তৈরি করছে?'

'আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন,' বলল রানা। 'সত্যি দুঃখিত।' একটু থেমে আরও নরম সুরে আবার বলল, 'প্রশ্নটা আসলে আপনার কমান্ডিং অফিসারকে করা উচিত, তাই না?'

অপরপ্রান্ত থেকে ক্যাপ্টেন কথা বলল না।

'আপনি আছেন, ক্যাপ্টেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আর কোন উপদেশ আছে?' তিক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল জেমসন।

'আপনি ঠিক জানেন, ওরা এদিকেই আসছে?'

'তা আসছে না,' বলল জেমসন।

'আসছে না, মানে?'

'ওরা পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু আমরা যখন ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি, ওরাও তেমনি আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে। কোর্স বদলে এদিকেই আসবে।'

আট

দৃঢ় মনোবল নিয়ে ফার্স্ট সেক্রেটারির সামনে দাঁড়ালেন এয়ার মার্শাল ঝনঝেনিৎসিন। অনেকক্ষণ ধরে ভোগাবার পর ধারণাটা তাঁর মাথায় ধরা দিয়েছে। এখন তিনি জানেন, পিটি ডাভের জন্যে রিফুয়েলিঙের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও ধারণাটা তিনি খোলসা করে সরাসরি বলবেন না। কোন অবস্থাতেই ফার্স্ট সেক্রেটারির বিরাগভাজন হতে চান না তিনি। যুদ্ধমন্ত্রীর পদটা পাবার লোভে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে ফার্স্ট সেক্রেটারির প্রিয়পাত্র হতে পেরেছেন, একটা ভুল করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে রাজি নন। কিছুদিনের মধ্যে জেনারেল বাকুনিন অবসর নেবেন, তাঁর স্বপ্ন বাস্তব হয়ে ধরা দিতে আর বেশি দিন নেই। মনে মনে ভাল করেই তিনি জানেন, পিটি ডাভ যদি মিগ-৩১ নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারে, ব্যর্থতার জন্যে তাঁকেই দায়ী করা হবে।

'আমার মনে হয়,' নরম সুরে বললেন তিনি, 'ফার্স্ট সেক্রেটারি, এই কন্ট্যাক্ট, বরফের জন্য অস্পস্ট হলেও, তদন্ত করে দেখা দরকার।'

ফার্স্ট সেক্রেটারি কিছু বললেন না। ডিম্বাকৃতি টেবিলে বসে ম্যাপে চোখ বুলাচ্ছেন তিনি। এক সময় মুখ তুললেন, 'আবার বলুন।'

‘একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছি,’ মৃদু কণ্ঠে বললেন ঝনঝেনিৎসিন। ‘ওরা হয়তো বড় একটা বরফের মাঠকে পিটির রানওয়ে হিসেবে ঠিক করে রেখেছে। পিটি হয়তো মিগ-৩১ নিয়ে সেই রানওয়েতে ল্যান্ড করেছে।’

‘কিন্তু রিফুয়েলিং?’

‘বরফের একটা মাঠ...তার নিচে লুকিয়ে থাকতে পারে না একটা সাবমেরিন?’ এয়ার মার্শাল লক্ষ করলেন, ফার্স্ট সেক্রেটারির চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ‘আর হয়তো সেই সাবমেরিনই রিগার সোনারে ধরা পড়েছে।’

‘তারমানে আপনার ধারণা, এয়ার মার্শাল, পিপি-ওয়ান নিয়ে ল্যান্ড করেছে পিটি ডাভ?’

না তাকিয়েও এয়ার মার্শাল বুঝতে পারলেন, অপারেটর থেকে শুরু করে যুদ্ধমন্ত্রী, সবাই তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ‘জ্বী, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি। মনে হচ্ছে, নর্থ কেপে যে আমেরিকানদের প্লেন আর সাবমেরিন রয়েছে, ওগুলো ডিকয়, ওরা চাইছে আমরা ওগুলোর পিছনে ছুটি। কিন্তু পিটি ডাভের রিফুয়েলিং পয়েন্ট ওদিকে নয়। আরও দেখুন...’

‘বলে যান।’

‘সোনার কন্ট্যাক্টটা কোন্ দিকে লক্ষ করেছেন? রিগা আর তার এসকর্টদের রিপোর্ট বলছে, পিটি ডাভকে মিগ-৩১ নিয়ে ওদিকেই যেতে দেখেছে তারা।’

‘হুঁ।’ গম্ভীর আওয়াজ বেরুল ফার্স্ট সেক্রেটারির গলা থেকে। ম্যাপের দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে যাবার পর মুখ তুললেন, বললেন, ‘ঠিক আছে, এত জোর দিয়ে যখন বলছেন, এসকর্টিং সাবমেরিনগুলোর একটাকে ওদিকে পাঠানো যেতে পারে তদন্ত করে দেখার জন্যে।’

‘কিন্তু, কমরেড ফার্স্ট সেক্রেটারি, মাত্র একটা

সাবমেরিন.···ধরুন, যদি.···'

ঝনঝেনিৎসিনকে থামিয়ে দিলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'একটা, তার বেশি নয়, এয়ার মার্শাল। ওখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

' চল্লিশ মিনিট।'

'বেশ। তদন্তে যদি দেখা যায় আপনার অনুমান মিথ্যে নয়, তখন অবশ্যই পিপি-টুকে ওখানে যেতে বলা হবে। কেপ থেকে ফুলস্পীডে চলে আসবে বেরেনকো।'

স্বস্তি অনুভব করলেন ঝনঝেনিৎসিন। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে এনকোডিং-কনসোলের সামনে দাঁড়ালেন, নিজেই নির্দেশ পাঠাতে শুরু করলেন রিগার ক্যাপ্টেনকে।

সবুজ সোনার স্ক্রীনের সচল বাহুগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করতে শুরু করল রানার। শার্কের কন্ট্রোল রূমে, অপারেটরের মাথার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ও, সোনার থেকে বেরিয়ে আসা ওয়ার্নিং সিগন্যাল শুনে বুঝতে পারছে কি ঘটবে। স্ক্রীনের একটা ব্লিপ, একটা এসকর্ট সাবমেরিন, পশ্চিমমুখো কোর্স বদলে একাই এদিকে এগিয়ে আসছে। সোজা শার্কের দিকে।

এটা লং রেঞ্জ সোনার স্ক্রীন, এর আওতায় রয়েছে ত্রিশ মাইল। এই মুহূর্তে বিশ মাইল দূরে রয়েছে সাবমেরিনটা। স্ক্রীন থেকে বাকি দুটো ব্লিপ অদৃশ্য হয়ে গেছে রানা কন্ট্রোল রূমে ঢোকার আগেই।

'আর কতক্ষণ লাগবে?' নিস্তব্ধতা ভেঙে জানতে চাইল রানা। ওর হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে।

'ঠিক বলা যাবে না, স্যার,' অপারেটর জবাব দিল। 'লং রেঞ্জ সোনার স্ক্রীনে ব্লিপ দেখে কিছু বলা ভারি কঠিন—ডিসটরশন ফ্যাক্টর টোয়েনটি পার্সেন্ট।'

‘রাশিয়ান সাবমেরিনের স্পীড কত?’

‘জানি না!’ গম্ভীর জেমসন। ‘ওটা যে কি ধরনের সাবমেরিন তাও আমার জানা নেই।’ তার চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ। ‘শর্ট রেঞ্জ সোনারে ধরা পড়ুক, তখন জানা যাবে। একটা কমপিউটর ওটাকে আইডেনটিফাই করবে, কিন্তু আরও কাছে না এলে থ্রি-ডি ইমেজ কমপিউটরের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না।’

‘কন্ট্যাক্ট বেয়ারিং রেড থ্রী-নাইনার, আরও কাছে চলে আসছে,’ ঠাণ্ডা, যান্ত্রিক সুরে বলল অপারেটর।

‘কি করবেন বলে ভাবছেন?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাপ্টেন। তারপর কঠিন সুরে বলল, ‘ভাবার কথা তো আপনার। আগেই তো বলেছি, আমরা নিরস্ত্র। এখন আপনার মর্জির ওপরই নির্ভর করছে এতগুলো লোকের জীবন-মরণ।’

‘তার মানে?’

‘আপনার মিগে দুটো মিসাইল ছিল, আরও দুটো সাপ্লাই দিয়েছি আমরা,’ বলল ক্যাপ্টেন। ‘রাশিয়ানরা এসে পড়ার আগে রানওয়ে মেরামত হয়ে যাবে, আপনি নিরাপদে উঠে যেতে পারবেন আকাশে। তারপর আপনার যদি দয়া হয়, মিসাইল ছেড়ে সাবমেরিনটাকে ডুবিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমরা সবাই পালিয়ে যাবার সময় পাব। অবশ্য দুনিয়ায় এমন লোকের অভাব নেই যারা উপকারের বিনিময়ে উপকার করার গরজ দেখায় না...’

‘অসম্ভব!’ তীব্র প্রতিবাদ জানাল রানা। ‘এ হয় না!’

‘কেন হয় না?’ জানতে চাইল ক্যাপ্টেন। রানার উত্তর শুনে অবাক হয়েছে তা মনে হলো না।

‘সাবমেরিনে একশোর ওপর লোক আছে, ওদের আমি মারতে পারব না!’

‘কেন পারবেন না?’

'এটা যুদ্ধ নয়।'

'কিন্তু আপনি ওদের না মারলে ওরা আমাদের মারবে,' মনে করিয়ে দিল জেমসন।

'মারবেই, তা নাও হতে পারে,' বলল রানা।

'বেশ, তাহলে আকাশে উঠেই লেজ তুলে পালাবেন না দয়া করে,' প্রস্তাব দিল জেমসন। 'অপেক্ষা করবেন, দেখবেন ওরা কি করে। যদি দেখেন ওরা হামলা চালাতে যাচ্ছে, তখন মিসাইল ছুঁড়বেন। রাজি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। তারপর এদিক ওদিক মাথা নাড়ল।

'মানে?'

'ওরা হামলা চালালে কি করব, আমি জানি না। আগে হামলা চালাক, তখন সিদ্ধান্ত নেব। আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন। আমার ওপর নির্দেশ আছে শুধু আত্মরক্ষার একান্ত প্রয়োজন ছাড়া রাশিয়ানদের লক্ষ্য করে একটা গুলিও ছোঁড়া যাবে না।'

'তারমানে আপনার কাছে এতগুলো লোকের প্রাণের কোন মূল্য নেই!'

রানা চুপ করে থাকল।

'জানতে পারি এই নির্দেশ কে দিয়েছে আপনাকে?'

মেজর জেনারেল রাহাত খান, মনে মনে বলল রানা। 'দুঃখিত, ক্যাপ্টেন।'

কিছুক্ষণ আপন মনে চিন্তা ভাবনা করল জেমসন, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, নিজেদের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করে নেব।'

'কি রকম?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'আপনাকে দেয়ার জন্যে সীল করা একটা প্যাকেট আছে আমার কাছে,' বলল ক্যাপ্টেন। 'সময়মত চেয়ে নেবেন ওটা।

ওতে সম্ভবত আপনার রুটের কথা বলা আছে।'

'আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি, ক্যাপ্টেন।'

'নিজেদের ব্যবস্থা মানে...ওয়ারড্রোব থেকে কাপড়চোপড় বের করে ছদ্মবেশ নিতে হবে আমাদের,' বলল জেমসন।

'কন্ট্যাক্ট বেয়ারিং এখনও রেড থ্রী-নাইনার, কাছে চলে আসছে,' রিপোর্ট করল অপারেটর। তার চেহারা বা কণ্ঠস্বরে ভয় বা দুশ্চিন্তার কোন ছাপ নেই।

'ব্লোয়ার দাও আমাকে,' হুকুম করল ক্যাপ্টেন। গার্ডনার তার হাতে একটা মাইক্রোফোন ধরিয়ে দিল, ট্র্যান্সমিটারের বোতাম টিপে চালু করে দিল সেটা।

মাইক্রোফোনে জেমসন বলল, 'আমি ক্যাপ্টেন বলছি, মন দিয়ে শোনো তোমরা। "গোবেচারা"-র ভূমিকায় নামছি আমরা, এই মুহূর্তে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো সবাই।' এক সেকেন্ড বিরতি নিল সে, তারপর আবার শুরু করল, 'আর হয়তো ত্রিশ মিনিট সময় আছে, কমও হতে পারে, কাজেই...'

রানাকে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত দিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে এল ক্যাপ্টেন।

'গোবেচারা মানে?'

কেবিনের দরজায় তালা লাগাল জেমসন। ওয়াল-সেফ খুলে সেলোফেন কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট বের করে ধরিয়ে দিল রানার হাতে। প্যাকেটটা সীল করা। নেড়েচেড়ে দেখছে রানা, এই সময় চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল, ওয়াল-সেফের ভেতর থেকে একটা ক্যাপসুল বের করে পকেটে ভরল জেমসন।

'কি ওটা?' অস্ফুটে জানতে চাইল রানা।

'ডেথ পিল,' বলে ক্ষীণ একটু হাসল জেমসন।

সবই বুঝল রানা। মুখে কথা যোগাল না।

ওয়াল-সেফ বন্ধ করল ক্যাপ্টেন।

রানা মৃদু গলায় আবার জানতে চাইল, 'গোবেচারা কি?' প্যাকেটের সীল খুলতে শুরু করেছে ও।

'একটু পরই তো ওপরে যাব, তখন নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। এই গোবেচারার ভূমিকাই আমাদেরকে বাঁচিয়ে দেবে।'

সীল করা প্যাকেটের ভেতর যে ম্যাপ, নকশা আর নির্দেশ রয়েছে সেগুলো পিটি ডাভের কাজে লাগত, কারণ পিটি ডাভ আর্কটিক থেকে ইসরায়েলে যেত। কিন্তু রানা যাবে বাংলাদেশে। তবে আবার রিফুয়েলিঙের জন্যে পিটি যেখানে নামত, রানাও সেখানেই নামবে। ফিনিশ উপকূল পেরিয়ে স্টকহোমের দিকে যাবে ও। ওখান থেকে এশিয়ার দিকে যাবার জন্যে বিদেশী এয়ারলাইনসের প্লেনের ঠিক পিছনে থাকতে হবে ওকে। একটা প্লেনের পিছনে আর একটু নিচে থাকলে প্যাসেঞ্জার-প্লেনের আরোহীরা ওকে দেখতে পাবে না, সেই সাথে ইনফ্রা-রেড স্ক্রীনেও ধরা পড়বে না। ইনফ্রা-রেড হিট-সোর্সের সন্ধান ঠিকই পাবে, কিন্তু সেটার উৎস প্যাসেঞ্জার প্লেন বলে ধরে নেবে রাশিয়ানরা। এ-সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ আগেই পেয়েছে রানা। জানে, রাশিয়ানরা শেষ চেষ্টা হিসেবে তাকে অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে। ইউরোপ আর এশিয়ার কোন্ এয়ারপোর্ট থেকে কোন্ প্লেন কখন টেক-অফ করে কোন্‌দিকে যাবে, সব মুখস্থ করতে হয়েছে ওকে।

একটা ছাইদানী দিল জেমসন, কাগজ আর ম্যাপ সব তাতে ফেলে পুড়িয়ে ফেলল রানা। বলল, 'চলুন, রানওয়ে মেরামত হয়েছে কিনা দেখি।'

সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারের অপারেশন রূমে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। নর্থ কেপ এলাকায় যে টোপ ফেলা হয়েছিল, রাশিয়ানরা সেটা গিলেছে, এসকর্টসহ ওদের মিসাইল ক্রুজার রিগা রওনা হয়ে

গেছে সেদিকে। ‘জননী-১’ থেকে ক্যাপ্টেন জেমসন ঝুঁকি নিয়ে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে, জানা গেছে এয়ারকিং নিয়ে নিরাপদেই ল্যান্ড করেছে পিটি ডাভ, রিফুয়েলিঙের কাজও শেষ।

সাফল্যের আনন্দে পালা করে পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছেন মরগ্যান আর ময়নিহান। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স চীফ ময়নিহানের বেসুরো গলার খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি থামতেই চাইছে না, সারাক্ষণ দুই কান পর্যন্ত লম্বা হয়ে আছে তাঁর ঠোঁট। নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছেন তিনি, নির্লজ্জ আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন, ‘বলেছিলাম না, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স রাশিয়াকে এক হাত দেখিয়ে দেবে! আর পিটি, ও তো সুপারম্যান!’

‘কোন সন্দেহ নেই,’ গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন সি.আই.এ. চীফ মরগ্যান। ‘জেমস বণ্ডকেও ম্লান করে দিয়েছে ও।’

‘আমি তো বলি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্পাই পিটি,’ কথাটা বলে একে একে সবার দিকে তাকালেন তিনি, যেন চ্যালেঞ্জ করছেন।

যখন ওরা জানবে, মিগ-৩১ ইসরায়েলের দিকে যাচ্ছে না, বা যখন জানবে ইসরায়েলি পাইলট পিটি ডাভ রাশিয়ায় ঢুকতেই পারেনি, রানা ইনভেস্টিগেশনের এজেন্টরা তাকে লন্ডনে বন্দী করে রেখেছিল, কি রকম দেখতে হবে ওদের চেহারা? কল্পনা করতে গিয়ে হেসে ফেললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। কামরার মাঝখানে একটা টেবিলে বসে আছেন তিনি। কল্পনায় দেখলেন, রবার্ট মরগ্যান নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছেন, আর ভেউ ভেউ করে কাঁদছেন ময়নিহান।

‘ছোটখাট একটা উৎসব করা যায় না?’ প্রস্তাব দিলেন ময়নিহান। আড়চোখে ঘরের কোণে তাকালেন তিনি, ওখানে একটা ট্রলি রয়েছে, তাতে হুইস্কির বোতল, বরফ ইত্যাদি

সাজানো।

'অবশ্যই, অবশ্যই!' শশব্যস্ত হয়ে লিলিয়ানকে ডাকলেন মরগ্যান। কিচেন থেকে লিলিয়ান আর আইলিন বেরিয়ে এল, এখনও তারা আঁটসাঁট ট্রাউজার আর শার্ট পরে আছে।

হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে তিনজন পরস্পরের দিকে তাকালেন। নিজের গ্লাসটা উঁচু করে ধরলেন ময়নিহান, বললেন, 'এয়ারকিঙের শুভকামনায়, আর পিটি ডাভের স্বাস্থ্যকামনায়।'

মরগ্যানও তাই বললেন, কিন্তু হ্যামিলটন কি বললেন কিছু বোঝা গেল না।

'জননী-১' লক্ষ্য করে রাশিয়ান সাবমেরিন আসছে, ক্যাপ্টেন জেমসন আবার একবার ঝুঁকি নিয়ে যদি এই খবরটা দিত ওঁদের, হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেতেন সবাই।

রানা আর জেমসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হাডসন। তার হুডের চারপাশে ঘাম জমেছিল, সাথে সাথে তা বরফ হয়ে গেছে। তার ঠোঁটের ওপর গোঁফেও বরফ কুচি লেগে রয়েছে। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা।

'বলো, হাডসন,' প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন, মইয়ের গায়ে হাত রেখে শার্কের সেইলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

'কাজ প্রায় শেষ,' বলল হাডসন। 'ত্রিশ ফিট রিজ ভেঙে দিয়েছি আমরা।'

'ভেরি গুড...'

'নট সো গুড,' ক্যাপ্টেনকে বাধা দিয়ে বলল চীফ ইঞ্জিনিয়ার। 'কারণ, আসল কাজটাই এখনও বাকি। টারবাইন থেকে হোস টেনে নিয়ে যেতে হবে ওখানে, প্রচুর পাইপ দরকার। এতে সময় লাগবে খুব বেশি।'

রানা আর জেমসন পরস্পরের দিকে তাকাল। রাশিয়ান

সাবমেরিন কাছে চলে এসেছে, হাতে সময় নেই।

'কতক্ষণ লাগবে?'

'আমার লোকেরা ক্লান্ত, ঠাণ্ডায় নড়াচড়া করতে পারছে না, তার ওপর কুয়াশা আগের চেয়ে বেড়েছে...কতক্ষণ লাগবে আন্দাজ করে বলা কঠিন।'

'যত তাড়াতাড়ি পারো শেষ করো,' নির্দেশ দিল জেমসন। 'রানওয়ে কোথাও উঁচু-নিচু থাকলে চলবে না, মখমলের মত মসৃণ হওয়া চাই—দেড়শো নট স্পীডে ওই জায়গাটা পেরোবে এয়ারকিং, কিছুর সাথে ধাক্কা লাগলে স্রেফ উল্টে যাবে। কোদাল দিয়ে চাঁছলেই হবে না, স্টীম স্প্রে করতে হবে। যদি সময় পাও, রানওয়ের এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত।'

'কিন্তু তার কি কোন দরকার আছে, ক্যাপ্টেন?' প্রতিবাদের সুরে জিজ্ঞেস করল হাডসন।

'আছে। প্রচুর তুষার জমেছে, এয়ারকিঙের চাকা তাতে আটকে যেতে পারে।'

চেহারায় অসন্তুষ্ট ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল হাডসন।

'আমরা গোবেচারার ভূমিকায় নামছি,' বলল জেমসন। 'এদিকটা তদারক করে তোমাদের কাজ দেখতে যাব আমি।'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল হাডসন, শার্কের গা ঘেঁষে সামনের দিকে এগোল। টারবাইনের ওপরের হ্যাচ থেকে দু'জন ক্রু হোস পাইপের বিশাল আকৃতির লুপ টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনছে।

'আসুন,' রানাকে বলল ক্যাপ্টেন, 'আপনাকে এবার গোবেচারা কি দেখাই।'

রানাকে স্বীকার করতেই হলো, গোবেচারা একটা চমৎকার বুদ্ধি। প্রথমে মনে হলো, ক্রুদের এই দলটা কোন নিয়ম মানছে না, এক একজন এক একটা অকাজে খামোকাই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। সবার কাজ শেষ হলে যে একটা কিছু দাঁড়াবে,

দেখে মনেই হলো না। কিন্তু কিছুক্ষণ দেখার পর ব্যাপারটা উপলব্ধি করল রানা।

সাবমেরিনটা বদলে গিয়ে একটা আর্কটিক ওয়েদার স্টেশনে পরিণত হয়েছে। পকেট থেকে ট্র্যান্সমিটার বের করে দ্রুত নির্দেশ দিল জেমসন, টর্পেডো-টিউব আর ফরওয়ার্ড ক্রু কোয়ার্টার সাগরের লোনা পানি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে, কোনমতেই যেন কেরোসিনের গন্ধ না থাকে। রাশিয়ানরা ওই জায়গাগুলো ভিজে কেন জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেয়া হবে, তাও জানিয়ে দিল সে–খোল কোথাও লিক করছে। বরফের ওপর তড়িঘড়ি খাড়া করা হয়েছে একটা বিশাল ঘর, ঘরের ভেতর ভোঁতা চেহারার কাঠের ফার্নিচার সাজানো হয়েছে। জানালা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে রানা দেখল, সদ্য খাড়া করা দেয়ালে ক্রুরা ম্যাপ, আর চার্ট ঝোলাচ্ছে। ঘরের ভেতর অনেকগুলো ক্লিপবোর্ড, প্রতিটি ক্লিপবোর্ডে কাগজ আটকানো হয়েছে, প্রতিটি কাগজে জ্যামিতিক রেখা আর সংখ্যা ঠাসা। ঘরের বাইরে দুটো আকাশ ছোঁয়া মাস্তুল দাঁড় করানো হয়েছে। সবচেয়ে লম্বাটা রেডিও মাস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হবে, অপরটার মাথায় ঘুরবে অ্যানিমোমিটার। আরও অনেক যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে এখানে সেখানে, কোনটা বাতাসের গতিবেগ মাপবে, কোনটা তুষারের ঘনত্ব। মোট কথা, একটা ওয়েদার-স্টেশনে যা যা থাকা দরকার, সবই আছে। এমন কি বিশাল আকৃতির ওয়েদার-বেলুন পর্যন্ত বাদ যায়নি।

পনেরো মিনিটের মধ্যে যে-টুকু কাজ বাকি ছিল শেষ হয়ে গেল। এটা যে একটা ওয়েদার-স্টেশন, একবাক্যে স্বীকার করতে হবে সবাইকে।

সাবমেরিনে ফিরে আসার সময় রানা ভাবল, এ তবু মন্দের ভাল। সাবমেরিন আর তার ক্রুদের অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে খারাপ লাগত ওর, হয়তো শেষ পর্যন্ত ফেলে যেতে পারতই না।

‘এখন আপনার চলে যাওয়ার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে,’ সাবমেরিনের দিকে ফিরে আসার সময় রানাকে বলল জেমসন। ‘ওরা এসে পড়ার আগেই যদি আপনি কেটে পড়তে পারেন, তাহলে কিছুই ওরা প্রমাণ করতে পারবে না।’

‘কিন্তু আপনি তখন বললেন...’

মুচকি হাসল জেমসন। ‘কি বলেছি, ভুলে যান। আপনি যদি সত্যি সত্যি মাথার ওপর চক্কর দিতে থাকেন, সেটাই আমাদের জন্যে বিপদ ডেকে আনবে, ওরা বুঝে নেবে আমরাই আপনাকে ফুয়েল সাপ্লাই দিয়েছি। আকাশে হারিয়ে যেতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?’

উত্তর না দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, ‘কিন্তু এই বরফে হিটসোর্সের সন্ধান পেয়েছে ওরা। প্রশ্ন করলে কি বলবেন?’

‘কি বলব সেটা আপনার মাথাব্যথা নয়। জানি না—এরপর আর কথা থাকে?’

‘কিন্তু...’

‘আমাদের কি হবে সেটা আমরা বুঝব, আপনি শুধু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গায়েব হয়ে যাবেন।’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

‘বেশ।’

পার্কার পকেট থেকে আবার ট্র্যান্সমিটারটা বের করে বোতাম টিপল জেমসন। ‘ক্যাপ্টেন বলছি—গার্ডনার আছ?’

গার্ডনারের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ‘স্যার।’

‘বন্ধুদের খবর কি?’

সাথে সাথে জবাব এল না, তারপর গার্ডনার বলল, ‘এখন আমরা কমপিউটর-প্রেডিকশন পাচ্ছি, স্যার। সোনার-কন্ট্যাক্ট, শতকরা সাত পার্সেন্ট ভুল হবার সম্ভাবনা...’

‘বলে যাও। খারাপ খবরের জন্যে আমি তৈরি।’

‘আর সতেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে রাশিয়ান সাবমেরিন।’

‘জেসাস!’ আঁতকে উঠল ক্যাপ্টেন।

‘কোর্স আর স্পীড দেখে বোঝা যাচ্ছে, সরাসরি আমাদের দিকে আসছে, স্যার।’

ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল জেমসন। ‘শুনলেন তো?’ মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘ঠিক আছে, গার্ডনার—আমার সেট অন করা থাকছে, এক মিনিট পর পর খবর দেবে তুমি।’

‘স্যার।’

‘ক্লোজ-রেঞ্জ সোনারে ধরা পড়লে, মিনিটে দু’বার রিপোর্ট চাই।’

‘স্যার।’

বুক পকেটে ক্লিপ দিয়ে সেটটা আটকে নিল জেমসন। দুটো হোস পাইপ এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কুয়াশার ভেতর, রানাকে নিয়ে সেদিকে এগোল সে। প্রেশার রিজ এখনও অনেক দূরে, তবু স্টীমের হিস হিস আওয়াজ এল কানে। ঘাড় ফিরিয়ে এয়ারকিংকে একবার দেখল রানা। আর ষোলো কি পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে রাশিয়ান সাবমেরিন, তার আগে পালানো সম্ভব হবে কি? শেষ মুহূর্তে কোন বাধা পড়ায় বরফের ওপর থেকে যেতে হবে না তো?

দু’জন লোক হোসের মুখ বগলদাবা করে ভাঙা পাঁচিলের ওপর স্টীম স্প্রে করছে। এবড়োখেবড়ো হয়ে আছে বরফের গা, তবে মসৃণ করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

হাডসন ওদের উপস্থিতি টের পেল, কিন্তু একবারও তাকাল না। কাজ শেষ হতে হুঙ্কার ছাড়ল সে, ‘এবার রানওয়ের ওপর স্প্রে করতে হবে, জলদি!’

‘কেন, স্যার?’ জানতে চাইল একজন ক্রু।

'আমি বলছি, আবার কেন!' ধমক লাগাল হাডসন।

ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হলো হোস পাইপ, কুয়াশার ভেতর আবার অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো। ওদের সামনে একবার থামল হাডসন, কিছু বলতে যাবে এই সময় জ্যান্ত হয়ে উঠল খুদে ট্র্যান্সমিটার। জেমসনের বুক পকেটের কাছ থেকে গার্ডনারের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'বলো?' জেমসনের মুখের পেশী টান টান হয়ে উঠল।

'কমপিউটর আইডেনটিফিকেশন: রাশিয়ান, হান্টার কিলার টাইপ সাবমেরিন, রেঞ্জ ফোর পয়েন্ট সিক্স মাইল। পৌঁছুতে আর নয় মিনিট লাগবে...'

'হোয়াট!' হুঙ্কার ছাড়ল জেমসন।

'দুঃখিত, স্যার—আমরা যা ধরেছিলাম সোনার তার চেয়ে বেশি ভুল করেছে...'

'এতক্ষণে বলছ!' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল ক্যাপ্টেন। 'সেট অফ করো! হাডসন?'

'স্যার?'

'শুনলে?'

'ইয়েস, স্যার। স্যার, রানওয়ে সমান করা এখন আর সম্ভব নয়। ত্রিশ গজ চওড়া, রানওয়ের সবটুকু...অসম্ভব!'

রানার দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন। 'শুনলেন?'

ভাঙা পাঁচিলের এদিকটা দেখাল রানা। 'এদিকটা একশো গজ পরিষ্কার করলেই হবে।'

'ঠিক জানেন?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন। 'অসুবিধে হবে না তো?'

মাথা নাড়ল রানা।

হাডসন তবু সন্দেহ প্রকাশ করল, একশো গজ মসৃণ করাও হয়তো সম্ভব হবে না। নিজের লোকদের কাছে চলে গেল সে,

নতুন করে কাজটা বুঝিয়ে দেবে। খানিক পর লোকগুলোকে নিয়ে কাছাকাছি ফিরে এল আবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কাজ দেখল রানা আর জেমসন। দু'জনেই জানে টেক-অফ করার জন্যে প্রয়োজনীয় স্পীড তুলতে হলে বরফের গা মসৃণ হতেই হবে। তা না হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা পনেরো আনা।

অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

খুদে ট্র্যান্সমিটারে আবার কথা বলছে জেমসন, 'গোবেচারা সম্পর্কে রিপোর্ট করো। আর মনে রেখো সবাই, এখন থেকে আবহাওয়া ছাড়া আর কোন বিষয়ে মুখ খোলা সম্পূর্ণ নিষেধ।' অপরপ্রান্তের রিপোর্ট শুনল সে। সন্তুষ্ট দেখাল তাকে। রানার দিকে ফিরে বলল, 'সব ঠিক আছে। এখন শুধু আপনি চলে গেলেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

অস্থির, আতঙ্কিত শোনাল গার্ডনারের কণ্ঠস্বর, 'আর সাত মিনিট, স্যার!'

কিন্তু ক্যাপ্টেনকে অবিচলিত দেখাল। 'ওরা যোগাযোগ করলে কি বলতে হবে, তুমি জানো।'

'স্যার।'

হাডসনের নেতৃত্বে বিদ্যুৎগতিতে কাজ করছে ক্রুরা। এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে হোস পাইপ, কুয়াশা মেশানো বাতাসে তুষারকণা উড়ছে। আরও একদল ক্রু এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে, রেডিওযোগে এদের ডেকে নিয়েছে হাডসন। সাদা তুষারকণা ঘন ধোঁয়া হয়ে উঠল, ঘিরে ফেলল ওদের সবাইকে।

'আর ছয় মিনিট, স্যার!'

'রেডিও কন্ট্যাক্ট?'

'এখনও হয়নি, স্যার।'

হোস পাইপ ভাঙা পাঁচিলের দিকে এগিয়ে আসছে।

'প্লেনে ওঠার সময় হয়েছে আপনার,' বলল জেমসন। 'ওরা

বোধহয় কাজটা শেষ করতে পারল না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আর এক মিনিট দেখি।'

'হাতে যে সময় থাকবে তাতে চোখের আড়ালে চলে যেতে পারবেন?'

'এতই দূরে, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'কন্ট্যাক্ট কনফার্মড, ফার্স্ট সেক্রেটারি,' ঝনঝেনিৎসিনের গলায় বিজয়ের উল্লাস প্রকাশ পেল।

জেনারেল বাকুনিন তাঁর পিঠ চাপড়ে দিলেন।

মৃদু হাসি দেখা গেল ফার্স্ট সেক্রেটারির ঠোঁটে। 'এখন কি করতে চান আপনি, এয়ার মার্শাল?'

'নর্থ কেপে পিপি-টুর সাথে যোগাযোগ করতে চাই,' বললেন এয়ার মার্শাল। 'বেরেনকোকে সঠিক পজিশন দিয়ে বলব, যে-কোন ভাবে পিপি-ওয়ানকে ধ্বংস করো।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'তবে, প্রথমে বেরেনকো পিটি ডাভকে একটা সুযোগ দেবে। সে যদি আত্মসমর্পণ করতে রাজি না হয়, তখন আর কোন উপায় থাকবে না।'

একটু ইতস্তত করলেন ঝনঝেনিৎসিন, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে কনসোলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পিপি-টুর সাথে যোগাযোগ হলো। বেরেনকোকে পরিষ্কার নির্দেশ দিলেন এয়ার মার্শাল—ঘণ্টায় চার হাজার মাইল গতিতে ছুটতে হবে তাকে। নতুন কোর্স কি হবে, ম্যাপে চোখ রেখে তাও জানিয়ে দিলেন।

অপর প্রান্ত থেকে অবিশ্বাসের সাথে বেরেনকো জানাল, 'ধরে নিন পিপি-ওয়ান নেই।'

'ওরা ডাকছে, স্যার—এই মুহূর্তে পরিচয় জানাতে বলছে,'

ক্যাপ্টেনের বুক পকেট থেকে গার্ডনারের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'কি বলতে হবে তুমি জানো, আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'রাশিয়ানরা আপনার সাথে কথা বলতে চাইছে, স্যার।'

'বলো, আসছি। বরফের আরেক প্রান্তে জরুরী একটা এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি আমি। বলো, ডাকতে পাঠানো হয়েছে।'

'স্যার। আর তিন মিনিট চোদ্দ সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা।'

রানাকে নিয়ে এয়ারকিঙের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেমসন। ক্রুরা হোস পাইপ নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে প্লেনের দিকে, সেদিকে তাকিয়ে আছে ওরা। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ককপিটে উঠতে হবে রানাকে।

বাইরে থেকে শান্ত দেখালেও, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে ভেঙে পড়ার মত অবস্থা হয়েছে জেমসনের। শেষ মুহূর্তে কোন বাধা পড়ে কিনা সেটাই তার ভয়। এয়ারকিং নিয়ে পিটি ডাভ চলে যাবার পর তাদের কপালে কি আছে আপাতত সেটা ভাবতে চাইছে না সে। মনে মনে জানে, রাশিয়ানদের বোকা বানানো অত সহজ নয়। থার্মোমিটার, মাস্ট, চার্ট ইত্যাদি দেখতে পেলেই যে বিশ্বাস করবে এটা একটা ওয়েদার-স্টেশন তা নাও হতে পারে।

নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠলে রানা বলল, 'আপনাদের এভাবে ফেলে যেতে খারাপ লাগছে আমার। আমার যদি কিছু করার থাকে, বলুন।'

জেমসন যেন রানার কথা শুনতেই পায়নি। হাডসন আর তার লোকদের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'ওরা কাজটা শেষ করতে পারল না।'

'ওদের আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সময় দেব,' বলল রানা।

‘আচ্ছা, রাশিয়ানরা যদি আপনাদের কোন ক্ষতি করে আমাকে সেটা জানাতে পারবেন?’

‘সেট অন করে রাখবেন।’

‘আমি তাহলে ফিরে আসব,’ কথা দিল রানা।

‘এসে হয়তো দেখবেন আমরা নেই,’ বিষণ্ন একটু হাসি ফুটল জেমসনের ঠোঁটে।

‘হামলা করতে যাচ্ছে বুঝতে পারলেই আমাকে...’

‘এমন তো হতে পারে, ওরা আমাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে?’

‘সেক্ষেত্রে আমি ফিরে এসে আপনাদেরকে উদ্ধার করতে পারি।’

‘কিভাবে? রাশিয়ান সাবমেরিন ডুবিয়ে দিয়ে? তাহলে তো আমরাও ডুবে মরব। আমাদেরকে ওরা জিম্মি হিসেবে পেলে আপনার কোন হুকুমই কানে তুলবে না। তাছাড়া, আপনি ফিরে আসার আগেই পানির নিচে ডুব দেবে ওরা।’

হাসল রানা।

‘হাসছেন যে?’

‘ওদের মিসাইল ক্রুজার কোথায় আছে খুঁজে নিতে অসুবিধে হবে না আমার,’ বলল রানা। ‘যদি বলি, ওটাকে ডুবিয়ে দেব, তবু আমার কথা কানে তুলবে না?’

‘কোন্ মিসাইল ক্রুজারের কথা বলছেন আপনি? রিগা?’

‘নাম জানি না।’

‘রিগাই। হাজার মাইলের মধ্যে আর কোন সোভিয়েত ক্রুজার নেই। ওটাকে আপনি ডুবিয়ে দিতে পারবেন?’ চোখে অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল জেমসন।

‘আমি পারব মানে, মিগ-৩১ পারবে,’ বলল রানা। ‘এই প্লেনের উইপনস সিস্টেম সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই।

সাধে কি আমরা এটা চুরি করছি?’

ঘর্মাক্ত কলেবরে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল হাডসন। চেহারায় রাগ আর ক্লান্তি। ‘পারলাম না, মি. ডাভ, দুঃখিত। রাশিয়ানদের এসে পড়ার সময় হয়ে গেছে। এরপরও যদি এখানে দেরি করেন আপনি, আমাদের সবার কপালে খারাবি আছে।’

রানা কিন্তু ব্যস্ত হলো না। ‘আরও এক মিনিট সময় দিলাম আপনাদের,’ বলল ও। ‘এর মধ্যে আরও যতটুকু পারেন করুন।’

হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল জেমসন। ‘বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে, মি. ডাভ।’

অভয় দিয়ে হাসল রানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল হাডসন।

‘আর দু’মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড, স্যার,’ গার্ডনারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ‘ওদের ক্যাপ্টেন বার বার আপনাকে চাইছে।’

‘অপেক্ষা করিয়ে রাখো,’ বলল ক্যাপ্টেন। ‘বরফ ফুঁড়ে উঠে আসবে, মনে হচ্ছে?’

‘না। সাধারণ কৌতূহল দেখাচ্ছে ওরা, একটু হয়তো সন্দেহও করছে, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছে বলে মনে হয় না–অন্তত কোন রকম চোটপাট দেখাচ্ছে না।’

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল রানা। একে কুয়াশা, তার ওপর মেঘে মেঘে ঢাকা পড়ে আছে আকাশ। কাঁধে একটা হাত পড়তে মুখ নামিয়ে জেমসনের দিকে তাকাল ও।

‘আর আপনাকে দেরি করতে দিতে পারি না,’ বলল ক্যাপ্টেন। ‘শুধু যে নিজেদের কথা ভাবছি, তা নয়–আমরাও চাই, এয়ারকিং নিয়ে আপনি নিরাপদে চলে যান। বিপদ কোনদিক থেকে আসে বলা যায় না, হাতে কিছুটা বেশি সময় রাখা উচিত ছিল, কিন্তু তা আপনি রাখেননি। এবার যান।’

গা থেকে পার্কা খুলতে শুরু করল রানা। ‘আর হয়তো দেখা

হবে না। আপনাদের সবাইকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'গেট আউট অভ হিয়ার,' কৃত্রিম ধমক লাগাল জেমসন। 'ভাল কথা,' হঠাৎ গলা খাদে নামিয়ে বলল সে, 'আপনাকে ব্যাপারটা বলি। একটাই ছেলে আমার, ইউ-এস এয়ারফোর্সের পাইলট। তাকে আমি আপনার গল্প শোনাব...যদি বাড়ি ফিরতে পারি।'

ততদিনে দুনিয়ার সবাই জেনে যাবে, আমেরিকানদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেছি আমি, ভাবল রানা। সবাই বুঝবে, রাশিয়ানদের ক্ষতি নয়, মস্ত উপকার করেছি। ছেলেকে তুমি গল্প শোনাবে বটে, কিন্তু সে গল্প হবে মাসুদ রানার নিন্দার বয়ান।

ফিউজিলাজের সামনে এসে দাঁড়াল রানা, একটা পা রাখল মইয়ের প্রথম ধাপে। একটা নিঃশ্বাস চাপল ও, তারপর উঠতে শুরু করল ওপর দিকে।

ককপিটে চড়ল রানা।

হেলমেট পরল ও। সকেটে অক্সিজেন, উইপনস্-কন্ট্রোল আর কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টের প্লাগ লাগাল। প্রথমে ধীরে ধীরে বরফের সর্ব দক্ষিণ প্রান্তে নিয়ে যেতে হবে এয়ারকিংকে, কারণ প্রেশার রিজ আর প্লেনের মাঝখানে যতটা সম্ভব বেশি রানওয়ে দরকার হবে ওর। জানে, বরফের ওদিকটা মসৃণ করা হয়নি। দ্রুত হাতে প্রস্তুতি নিল ও। প্রি-স্টার্ট চেক সারতে বেরিয়ে গেল মূল্যবান কয়েকটা সেকেন্ড। অ্যান্টি জি স্যুটের প্লাগ সকেটে ঢোকাল, চোখ বুলিয়ে দেখে নিল গজগুলো, তাতে ফ্ল্যাপ, ব্রেক আর ফুয়েল কি অবস্থায় আছে জানা গেল। ফুয়েল ট্যাংক কানায় কানায় ভরে আছে, আপনমনে হাসল রানা। হুড কন্ট্রোলে চাপ দিতে অটোমেটিক্যালি লক হয়ে গেল সেটা, তা সত্ত্বেও ম্যানুয়ালি লক করল ও। জেমসনের দেয়া হ্যান্ডসেটটা প্রেশার স্যুটের বুক পকেটে রয়েছে, গার্ডনারের গলা পেল ও।

‘রাশিয়ান সাবমেরিন...এক মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড...’

‘শুনলেন, মি. ডাভ?’ জেমসনের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনল রানা। ‘গুড লাক, ম্যান। হোস পাইপ সরিয়ে ফেলছি আমরা। বিদায়!’

ইগনিশন গ্যাং-লোড করল রানা, স্টার্টার-মটরের বোতামে চাপ দিল। জোড়া বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথে চালু হয়ে গেল কার্ট্রিজ। গম্ভীর একটা গুঞ্জন শোনা গেল, ধীরে ধীরে বাড়ছে আওয়াজটা। ফুয়েল-বুস্টারের বোতাম টিপল ও, সন্তর্পণে খুলতে শুরু করল থ্রটল, যতক্ষণ না আর-পি-এম গজের কাঁটা টোয়েনটি সেভেন পার্সেন্টে স্থির হলো।

এরপর ব্রেক রিলিজ করে দিল রানা।

ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। নড়ল না মিগ-৩১।

নয়

প্রথমেই সন্দেহ জাগল, স্যাবোটাজ? প্লেনটাকে অচল করে রেখেছে কেউ?

‘কি হলো?’ জানতে চাইল জেমসন। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সে।

থ্রটল টেনে নিল রানা, আবার ব্রেক অ্যাপ্লাই করল। স্যাবোটাজের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি, রাশিয়ানদের দোসর কেউ থাকতেও পারে আমেরিকান সাবমেরিনে, কিন্তু আরেকটা আশঙ্কার কথা ভাবছে ও।

হুড আর ফেস-মাস্ক খুলে মুখের সামনে হ্যান্ডসেট তুলল রানা, চিৎকার করে বলল, ‘ক্যাপ্টেন–হোস পাইপ আনতে বলুন, কুইক!’

‘কেন, কি হয়েছে…?’

‘এদিকে এগিয়ে এসে দেখুন তো, তুষারে বোধহয় চাকা দেবে গেছে।’

‘সর্বনাশ!’

ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পাবার আগেই দেখা গেল হাডসন আর তার লোকেরা হোস পাইপ টেনে আনছে। জানালার দিকে ঝুঁকে রানা দেখল, ক্যাপ্টেন মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চারপাশে গরম বাশ্চ, তাকে প্রায় ঢেকে ফেলার উপক্রম করেছে। খোদ হাডসনের বগলের নিচে একটা হোস পাইপের মুখ দেখল রানা, চাকার চারপাশে স্টীম স্প্রে করছে। সাবধান করতে চাইল রানা, টায়ারে বেশি গরম স্টীম অনেকক্ষণ ধরে ব্যবহার করলে ওগুলো গলে যাবে। কিন্তু স্প্রে-র হিস হিস আওয়াজে ওর চিৎকার বোধহয় কারও কানে গেল না।

এক মিনিট পর ফিউজিলাজের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল হাডসন। ‘সব পরিষ্কার, মি. ডাভ। এবার দেখুন ডানা মেলতে পারেন কিনা।’

হাডসনকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল রানা। আরেকবার হুড নামাল, গজগুলো চেক করল, তারপর খুলে দিল থ্রটল। আর-পি-এম গজ ফিফটি ফাইভের ঘরে স্থির হলো। ব্রেক রিলিজ করল রানা, এবার সাথে সাথে মৃদু ঝাঁকি খেয়ে সামনে এগোল মিগ-৩১। ক্যাপ্টেন, হাডসন আর ক্রুরা সবাই দ্রুত পিছিয়ে গেল, হোস পাইপটা সাথে নিতে ভোলেনি।

এরই মধ্যে শার্ক থেকে নতুন পোশাক পরা লোকজন বেরিয়ে এসেছে। প্রত্যেকের পরনে সিভিলিয়ান পার্কা, প্রত্যেকের হাতে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম বা কাগজ পত্র। রাশিয়ানরা আসবে, তার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে সবাই।

প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে বরফের শেষ প্রান্তের দিকে চলল রানা।

একটা সরল রেখা ধরে এগোল মিগ-৩১, ফেরার সময় এই পথটাই ব্যবহার করবে ও।

ওই সামনে ধূসর রঙের সাগর। রাশিয়ান সাবমেরিনের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল ও। কোথায়! হয়তো শার্কের ক্যাপ্টেনকে চমকে দেয়ার জন্যে একেবারে কাছাকাছি এসে বরফের ওপর মাথা তুলবে বলে ঠিক করেছে ওরা।

এয়ারকিংকে আধ পাক ঘুরিয়ে নিল রানা। থ্রটল খুলে দিয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করল ও। প্রায় সাথে সাথেই টের পেল, জমে থাকা তুষারের বাধা পেয়ে প্লেনের গতি সাবলীল হতে পারছে না। মাত্রা ছাড়া পাওয়ার ব্যবহার করা যাবে না, তাতে তুষার ভেদ করে বরফের গায়ে চাকা ঢুকে যাবার ভয় আছে। যেখানে পার্ক করা ছিল এয়ারকিং, সেই জায়গাটা পেরিয়ে এল রানা। এখনও প্লেনের গতি সাবলীল নয়। এরপর শুরু হলো মসৃণ করা রানওয়ে। একটু পরই প্রেশার রিজটা চোখে পড়ল, ঝাপসা মত কি যেন একটা মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে। এদিকে তুষারের বাধা নেই, দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো এয়ারকিঙের গতি। থ্রটল খুলে স্পীড আরও বাড়াল রানা।

প্রতিটি মুহূর্ত রানওয়ের ঠিক মাঝখানে থাকতে হবে ওকে, কারণ ভুল সংশোধনের জন্যে ব্রেক করে কোন লাভ হবে না–বরফের ওপর কাজ করবে না ব্রেক। রাডার ঠিকমত কাজ করবে পঁচাশি নট স্পীডে, এই মুহূর্তে এয়ারকিঙের স্পীড পঞ্চাশের কিছু বেশি।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে সামনেটা দেখার চেষ্টা করছে রানা। এক সেকেন্ডকে মনে হলো এক যুগ। নব্বুই নট পেরিয়ে গেল স্পীড, রানওয়ের ঠিক মাঝখান ধরে ছুটছে এয়ারকিং। থ্রটল আরও খুলে দিল রানা। আর-পি-এম কাঁটা দ্রুত ওপর দিকে উঠছে। প্রেশার রিজের ফাঁকটা ছুটে আসছে অবিশ্বাস্য গতিতে।

ত্রিশ ফিট ফাঁক, একটু এদিক-ওদিক হলে ফিউজিলাজের সাথে বাড়ি খাবে প্রেশার রিজ। লাফ দিয়ে সামনে চলে এল ফাঁকটা, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। একশো পঞ্চাশ নট। তারপর একশো সত্তর।

স্টিক টেনে নিল রানা। রানওয়ের শেষ প্রান্তটা দেখতে পাচ্ছে ও। ওদিকে মসৃণ করা হয়নি বরফ। স্টিক টেনে নেয়ার সাথে সাথে বরফ থেকে শূন্যে উঠে গেছে চাকা।

রিয়ার-ভিউ মিররে রানা দেখল, ওর পিছনে তুষারের বিশাল একটা মেঘ জমেছে। খুশি হলো ও, ইতোমধ্যে যদি বরফের ওপর উঠে এসে থাকে রাশিয়ান সাবমেরিন, তবু ওকে দেখতে পাবে না। ফ্ল্যাপস তুলে নিল ও, আন্ডারক্যারিজ বন্ধ হয়ে গেল। থ্রটল আরও খুলে দিতে অ্যান্টি জি স্যুট সেঁটে বসল গায়ে, পরমুহূর্তে আবার ঢিল দিল। ফুয়েল প্রবাহ চেক করল রানা, দেখল, সবগুলো কাঁটা সবুজ ঘরে রয়েছে।

এবার আকাশের দিকে নাক তুলে প্রায় খাড়া উঠে যেতে শুরু করল মিগ-৩১। মাত্র কয়েক সেকেন্ডে মেঘের রাজ্য পিছনে ফেলে এল রানা। মাক মিটার উঠে যাচ্ছে–ওয়ান, ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান, ওয়ান পয়েন্ট টু, ওয়ান পয়েন্ট থ্রী, ওয়ান পয়েন্ট ফোর...

বাইশ হাজার ফিট উঠে এসে আশপাশে কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটাও দেখল না রানা। দিগন্ত রেখা পর্যন্ত শুধু গাঢ় নীল আকাশ।

উত্তর দিকে মুখ করে টেক-অফ করেছে রানা। নতুন কোর্স ধরতে হবে, যেতে হবে ফিনিশ উপকূলের দিকে। ডানা কাত করে দুশো আশি ডিগ্রী ঘুরে বাঁক নিল মিগ-৩১, প্রতি মুহূর্তে উঠে যাচ্ছে আরও ওপরে।

ইচ্ছে করলে পঁচিশ মাইল পর্যন্ত উঠতে পারে রানা।

এয়ারকিঙের এই ক্ষমতা দরকার হলে নিশ্চয়ই ব্যবহার করবে ও। যদিও অত উঁচুতে উঠলেও ইনফ্রা-রেড ডিটেকশন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তবে ব্যারেন্ট সী এক লাফে পেরিয়ে যাবে ও। ওর গতির সাথে পাল্লা দিয়ে কেউ পিছু নেয়ার কথা কল্পনাও করবে না। উপকূল পেরোবার খানিক আগে সী লেভেলে নেমে আসবে রানা, ফিনল্যান্ডের ওপর দিয়ে গালফ অভ বোথনিয়া আর স্টকহোমের দিকে ছুটবে। ফুলস্পীডে।

ওই স্পীডে অত নিচু দিয়ে উড়ে গেলে কোন প্লেন ওকে ছুঁতে পারবে না, কোন মিসাইলও ওকে স্পর্শ করতে পারবে না। অলটিমিটারের কাঁটা পঞ্চাশ হাজারের ঘর ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে আপনমনে হাসল রানা। এটা ওর গর্বের হাসি। আমি অজেয়, এই রকম একটা অনুভূতি জাগল মনে। কারও সাধ্য নেই আমাকে ধরে। তুলনা হয় না আমার।

নিজের ভুল টের পেল সে খানিক বাদেই।

ষাট হাজার ফিটে রানাকে দেখতে পেল বেরেনকো।

মেঘের রাজ্যে একটা ফাঁক, সেই ফাঁক দিয়ে ধূসর রঙের সাগর দেখা যায়। ফাঁকটা বেরেনকোর সামনে আর অনেক নিচে। হঠাৎ সেই ফাঁকে ভেপার-ট্রেইল দেখল সে। দেখেই বুঝল, পিটি ডাভ না হয়ে যায় না। রাডার স্ক্রীনে কোন ইমেজ নেই। ওটা নিশ্চই চুরি করা মিগ-৩১।

সার্জিক্যাল ছুরির মত কাজ করছে এখন বেরেনকোর মাথা। কি করতে হবে, সে জানে। পিটি ডাভের ফাইল পড়েছে সে, কমব্যাটে লোকটা কি রকম জানা আছে। মিগ-৩১ নিয়ে খুব বেশি ওড়েনি বেরেনকো, কিন্তু মিগ-২৫ চালাবার প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।

মিগ-৩১ চালিয়েছে বেরেনকো দুশো ঘণ্টার বেশি, আর পিটি

ডাভ চালিয়েছে পাঁচ ঘণ্টা—আরও কম। পিটি ডাভ তার মিশন সম্পূর্ণ করতে চায়, তার মনে অপরাধবোধ রয়েছে, আর বেরেনকো চায় প্রতিশোধ নিতে, তার মনে কোন অপরাধবোধ নেই। কে দুর্বল? জিজ্ঞেস করল বেরেনকো: আমি, না পিটি ডাভ?

ওকে আমি খুন করব।

পিপি-ওয়ানের ঠিক পিছনে থাকতে হবে তাকে, যাতে মিসাইলগুলো হিট সোর্সে আঘাত হানার সবচেয়ে ভাল সুযোগ পায়। ঠিক পিছনে থাকলে একেবারে শেষ মুহূর্তে ইনফ্রা-রেডে তাকে দেখতে পাবে পিপি-ওয়ানের পাইলট, তখন আর দেখতে পেলেও করার কিছু থাকবে না। বেরেনকো দেখল, একই গতিতে একটানা ওপরে উঠে যাচ্ছে পিপি-ওয়ান। বুঝল, পাইলট তার উপস্থিতি টের পায়নি। বেরেনকোর সরল যাত্রাপথ পেরোচ্ছে পিপি-ওয়ান, তাছাড়া ওটার স্টারবোর্ড সাইডে রয়েছে পিপি-টু, এই দুই কারণে ইনফ্রা-রেডের ব্লাইন্ড স্পট কিছুক্ষণের জন্যে লুকিয়ে রেখেছে তাকে। দ্রুত পিপি-ওয়ানের পিছনে চলে যেতে হবে তাকে, আর তারপর...

রানার এয়ারফোন জোড়া ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিল। ই-সি-এম ইকুইপমেন্ট ব্লিপ পাঠাচ্ছে। স্ক্রীনে মিসাইল দুটোকে দেখল রানা, কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। এ অসম্ভব! মিসাইল আসবে কোত্থেকে! অথচ স্ক্রীনের রেঞ্জিং বার-এর দিকে উঠে আসছে এক জোড়া মিসাইল, বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে ওর দিকে।

আত্মরক্ষার জন্যে নিজের অজান্তেই ইলেকট্রনিকের সাহায্য নিল হাত দুটো, কিন্তু মন এখনও ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছে না। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে ওর।

ইনফ্রা-রেড মিসাইলকে এড়িয়ে যাবার একটাই মাত্র উপায়

আছে এখন, জানে রানা। ইসরায়েলিরা মধ্যপ্রাচ্যে আর আমেরিকানরা ভিয়েৎনামে এই উপায়টা ব্যবহার করেছিল। ও যদি চোখের পলকে দিক বদলাতে পারে, তাহলে মিসাইলের নাকে বসানো ট্র্যাকিং সেনসর ওর ইঞ্জিনের হিট-সোর্স হারিয়ে ফেলবে, তারপর আর পিছু লেগে থাকা বা নতুন করে ধাওয়া করা সম্ভব হবে না।

গায়ের জোরে সামনের দিকে থ্রটল ঠেলে দিয়ে স্টিক পিছিয়ে আনল রানা, খাড়া ওপর দিকে উঠে যেতে চায়। মিগ-৩১ যেন সদ্য নিক্ষিপ্ত রকেট হয়ে গেল, তুমুল বেগে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। পরমুহূর্তে ঘন ঘন ডিগবাজি খেতে শুরু করল এয়ারকিং। দ্রুত এগিয়ে আসা মিসাইলের সেনসর অস্থিরমতি হিট-সোর্স হারিয়ে ফেলেছে। আচমকা শেষ একটা ডিগবাজি খেয়ে এয়ারকিঙের নাক নিচের দিকে তাক করল রানা, ডান দিকে কাত হয়ে বৃত্তের খানিকটা অংশ তৈরি করে চলে এল মিসাইলগুলোর সরল যাত্রাপথের নিচে। বিপদটা এল আরেক দিক থেকে। জিএফেক্টের ফলে ঝাপসা হয়ে গেল রানার দৃষ্টি। চোখে ভয় নিয়ে জি মিটারের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, দেখল, প্লাস এইট-জি তৈরি করেছে ও। দৃষ্টি আরও যদি ঝাপসা হয়, কিছুই দেখতে পাবে না। টেন জি মানে অন্ধ হয়ে যাওয়া, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে প্লেন। জি-মিটার ছাড়া এখনই আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও। পা আর পেটের ওপর সেঁটে বসা জি-স্যুটের স্পর্শ পাচ্ছে কি পাচ্ছে না।

স্ক্রীনে মিসাইলগুলোর পজিশন বদলে গেছে। নিজেদের আগের কোর্সে বহাল থেকে ছুটে চলে গেল ওগুলো, প্রত্যাশিত সংঘর্ষের মুহূর্ত পেরিয়ে গেছে আগেই। হিট সোর্স হারিয়ে ছুটতেই থাকবে ওগুলো, ফুয়েল শেষ হয়ে গেলে সাগরে পড়ে ডুবে যাবে।

ধীরে ধীরে স্টিক ঠেলে দিল রানা, দৃষ্টিসীমা প্রসারিত হলো,

কেটে গেল ঝাপসা ভাব, যেন ঘরের সবগুলো পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়েছে। গতি কমে আসতে শুরু করার সাথে সাথে ঘামতে শুরু করল রানা। আর একটু হলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল ওর!

স্ক্রীনে এখনও কিছু নেই। রানা এখনও জানে না, বেরেনকো পিপি-টু নিয়ে ওর ঠিক পিছনে ইনফ্রা-রেড ডিটেকশন ইকুইপমেন্টের নাগালের বাইরে, ব্লাইন্ড স্পটে রয়েছে।

অদৃশ্য শত্রু! যতটা না ভয় পেল রানা, তারচেয়ে বেশি ঘাবড়ে গেল। শত্রুকে ওর দেখতে পেতে হবে, তা না হলে এই যুদ্ধে টেকা দায়। এ কোন্ জাতের শত্রু, আন্দাজ করতে পারল রানা, কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চাইল না।...তা কি করে সম্ভব!

ওটা নিশ্চই একটা প্লেন হবে, আর কিছু হতে পারে না। ওর পিছু নেয়ার জন্যে ওর চেয়ে ওপরে উঠে গেছে। চুপিচুপি হামলা চালিয়ে খুন করতে চেয়েছিল ওকে, প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় নিশ্চই খেপে গেছে নিজের ওপর।

হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে রিয়ার-ভিউ মিররে দেখল, ঝিক করে উঠল একটা আলো–চকচকে ধাতব কিছুর গায়ে রোদ লাগলে এমন হয়। রাডারে এখনও কিছু নেই। এতক্ষণে উপলব্ধি করল রানা। কোইভিসতু আর ইসরাফিলভ দ্বিতীয় মিগ-৩১-কে অচল করে দিতে পারেনি। আগুনে কোন ক্ষতি হয়নি পিপি-টুর, কিংবা সামান্য যা হয়েছিল সেটা মেরামত করে ওর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে।

একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করল রানা। এখন আর সে অজেয় নয়, তার প্রতিদ্বন্দ্বী এসে গেছে। ওরটার মতই আরও একটা মিগ-৩১ রয়েছে আকাশে। পিপি-টুর পাইলট ওর চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ...

ঠোঁটে বাঁকা এক চিলতে হাসি ফুটল রানার। পালানোর কথা ভাবছে না ও, ভাবছে না মৃত্যুর কথা, জিয়া ইন্টারন্যাশনাল

এয়ারপোর্টে পিপি-ওয়ান নিয়ে নামতে না পারলে কতটুকু বিফল হবে ও, তা-ও ভাবছে না। এই মুহূর্তে গোটা ব্যাপারটা ওর আর পিপি-টুর পাইলটের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে এসেছে। ডুয়েল লড়ছে ওরা, জয় পরাজয়ের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। একজন পুরুষের বিরুদ্ধে আরেকজন পুরুষ।

মিররে আবার ঝিক্ করে উঠল আলো। এক ঝটকায় থ্রটল খুলে দিল রানা অনেকখানি। জানে, ওকে এদিক ওদিক কিছু করতে দেখলে বাধা দেয়ার জন্যে ছুটে আসবে পিপি-টু। খানিকটা উঠে অকস্মাৎ বাঁ দিকে একটু ঘুরল এয়ারকিং। বাঁ দিকে পিপি-টুকে পলকের জন্যে দেখতে পেল রানা, পিছু নিয়েছে ওর। আরও বাঁ দিকে ঘুরল এয়ারকিং, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে আগের কোর্সে ফিরে এল—ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে সাবধান হবার আগেই ককপিটের সাথে হেলমেট ঠুকে গেল। হাত দিয়ে লিভার টানল রানা, ব্যাট্ল্ পজিশনে চলে এল সীট। সীটের ওপর প্রায় শুয়ে আছে রানা এখন।

মিররে এখনও রয়েছে পিপি-টু। আদর্শ ফায়ারিং পজিশনের অপেক্ষায় রয়েছে বেরেনকো। চারটের মধ্যে দুটো মিসাইল নষ্ট হয়েছে তার, আন্দাজের ওপর নির্ভর করে আর কোন ঝুঁকি নেবে না সে।

স্ক্রীনে প্লেনটাকে দেখা গেল। নতুন কোন তথ্য নয়, আগেই জেনেছে রানা পিপি-টু পিছু নিয়েছে ওর। সূর্যের দিকে উঠে যাচ্ছে বেরেনকো, কেউ যাতে ওকে দেখতে না পায়। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। বাঁ দিকে সরল একটু, তারপর গড়িয়ে দেয়া ড্রামের মত ডিগবাজি খেতে শুরু করল এয়ারকিং। ভিউ-মিররে স্থির হয়ে আছে রানার দৃষ্টি, পিপি-টুর ডানা থেকে সাদা একটু ধোঁয়া বেরুতে দেখল। কামান দাগছে রাশিয়ান পাইলট। কমলা রঙের খুদে বড়ি মন্থর বেগে রানার দিকে এগিয়ে আসছে, যেন অনেক

কষ্টে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে পানির ভেতর দিয়ে।

রাশিয়ান পাইলটের মনের অবস্থা আঁচ করতে পারল রানা। উত্তেজনার তুঙ্গে উঠে গেছে সে, আর ধৈর্য ধরতে না পেরে দ্রুত একটা পরিণতির আশায় কামান দেগেছে—লেগেও তো যেতে পারে!

ডিগবাজির মধ্যে রয়েছে রানা, বুঝতে পারছে কামানের গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। রাশিয়ান পাইলট এখন আশা করছে এবার সূর্যের সাথে একই রেখায় চলে আসবে পিপি-ওয়ান। কিন্তু তা না গিয়ে আরও নব্বুই ডিগ্রী পর্যন্ত ডিগবাজি খেলো রানা, স্টিক টানল—আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ঝাঁকি খেলো এয়ারকিং, রানার তলপেটে খিল ধরল, কুঁকড়ে গেছে পেশী। আবার ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি। জি-ফোর্স এফেক্ট অসহ্য লাগল, ফেস-মাস্কের ভেতর চিৎকার করে উঠল রানা। জি-মিটারে প্লাস নাইন, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে রানা।

ডিগবাজি খাওয়া বন্ধ করে রানা দেখল, ওর সামনে চলে এসেছে পিপি-টু। একটু আগেই পরিস্থিতি উল্টে গেছে, এখন রানার পালা। ঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা।

দৃষ্টিসীমা আবার প্রসারিত হয়েছে।

রাশিয়ান পাইলটের পিছনে রয়েছে রানা, ওর ছয়শো গজ সামনে পিপি-টু। আঘাত হানার এইটাই ঠিক সময়। চিন্তার সাথে সাথে কেঁপে উঠল মিগ-৩১, এক জোড়া অ্যানাব মিসাইল স্যাৎ করে বেরিয়ে গেল। এইমিং সিস্টেমের সাহায্যে লক্ষ্যস্থির করেছে রানা, সিস্টেমটা বসানো আছে উইন্ডস্ক্রীনের সামনে। রাশিয়ান পাইলটের মত রানাও কোন গাইডেন্স পাবে না, কারণ থট গাইডেড সিস্টেমের সাথে রাডারের সংযোগ আছে, ইনফ্রা-রেডের নেই।

রাডার ইমেজ না পাওয়ায় ছোঁড়ার পর বেরেনকো তার

মিসাইলগুলোকে ইচ্ছেমত পরিচালিত করতে পারেনি। হতাশ হয়ে রানাও এখন উপলব্ধি করল, তারও সেই একই অবস্থা।

এই মুহূর্তে রানার কৌশলটাই ব্যবহার করছে রাশিয়ান পাইলট। থ্রটল সামনে ঠেলে দিয়ে খাড়াভাবে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে পিপি-টু, সেই সাথে ডিগবাজি খেতে খেতে সরে যাচ্ছে ডান দিকে। রানার ছুঁড়ে দেয়া মিসাইল দুটো লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

দু'জনই একজোড়া করে মিসাইল হারিয়েছে।

হাল ছাড়ল না রানা। পিপি-টুর পিছু ধাওয়া করল ও। থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিতেই আবার জি-ফোর্স এফেক্ট অসহ্য হয়ে উঠল, সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল দৃষ্টি।

আবার যখন দৃষ্টি ফিরে পেল, ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত আর্কটিক ওশেন আর গাঢ় নীল আকাশ। কিন্তু পিপি-টুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এক দুই করে কয়েকটা সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে রানা। অদৃশ্য শত্রুর সাথে এঁটে ওঠা প্রায় অসম্ভব। এই সময় ভিউ-মিররে আবার ঝিক্ করে উঠল কি যেন। বুঝতে পারল রানা, ওরই কৌশল ব্যবহার করে আবার পিছনে চলে গেছে পিপি-টু। বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে আসছে, দুই প্লেনের মাঝখানের ফাঁকটা বিপজ্জনকভাবে কমে এল। আবার মিসাইল ছুঁড়বে রাশিয়ান পাইলট।

এবার তৈরি রয়েছে রানা, পিপি-টু থেকে মিসাইল বেরুতেই দেখতে পেল। উজ্জ্বল, গাঢ় কমলা রঙের। কলাম টেনে নিল রানা, অনুভব করল জি-ফোর্স ওকে সীটের গভীরে নামিয়ে দিচ্ছে। কুঁকড়ে যাচ্ছে শরীর, চিবুক ঠেকল বুকের ওপর...

শরীরের সমস্ত ব্যথা আর অস্বস্তিবোধ অগ্রাহ্য করে সচেতন থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করল রানা। কন্ট্রোল কলামে হাত বুলাল অতি কষ্টে। কেঁপে উঠল প্লেন। পাক খেতে শুরু করল মিগ-৩১।

ফ্ল্যাট স্পিনের ভঙ্গিতে দিগন্তরেখার নিচে আর ওপরে পনেরো ডিগ্রী ওঠা-নামা করছে পিপি-ওয়ানের নাক। রানার অনেকটা ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল মিসাইল। স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করল রানা। কিন্তু জি-ফোর্স আবার বেড়ে ওঠায় বিচলিত বোধ করল ও, সাড়ে আট থেকে নয়-জি-তে উঠে যাচ্ছে। একশো নট মার্কারে স্থির হয়ে রয়েছে স্পীডমিটারের কাঁটা।

হেডফোনে ওয়ার্নিং সিগন্যাল শুনল রানা, টারবাইনে আগুন ধরে যেতে পারে, তাই অটোমেটিক ইগনাইটার কাজ শুরু করল—তারই সতর্ক-সঙ্কেত। প্লেন দ্রুত পাক খেতে শুরু করায় এয়ারফ্লো ইঞ্জিনকে বাধা দিচ্ছে। আর-পি-এম গজের ওপর চোখ বুলাল রানা, সিক্সটি পার্সেন্টে পৌঁছে থরথর করে কাঁপছে কাঁটা। টের পাবার আগেই আট হাজার ফিট নেমে এসেছে ও। দ্রুত নামছে আরও।

পিপি-টুকে রানা দেখতে না পেলেও, রাশিয়ান পাইলট চোখে চোখে রেখেছে রানাকে। পিপি-ওয়ানকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল বেরেনকো। ভাগ্য না হলে এমন চমৎকার, আদর্শ টার্গেট কেউ পায় না। এইবার শেষ করবে সে ইহুদি ব্যাটাকে।

প্লেনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে রানা। ঝরা পাতার মত সাগরের দিকে হু হু করে নামছে এয়ারকিং। নামতে নামতে সাগরের অনেক কাছে চলে এসেছে ও, সাগর আর ত্রিশ হাজার ফিট নিচে। এখনও নামছে প্লেন। কন্ট্রোল কলামে হাত দিল রানা, অন্ধের মত এটা সেটা ধরে টান দিল। হঠাৎ করেই বন্ধ হলো পাক খাওয়া। অপজিট রাডার ব্যবহার করল রানা, খুলে দিল থ্রটল। সাগর থেকে বিশ হাজার ফিট ওপরে রয়েছে ও। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আবার ফিরে পেয়েছে। এয়ারকিংকে সিধে করে নিল ও। আটকে থাকা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল সশব্দে।

স্ক্রীনে উজ্জ্বল একটা আভা দেখে চমকে উঠল রানা। ওরই সাথে কাছাকাছি নেমে এসেছে পিপি-টু। রানার সামান্য পিছনে, একটু ডানদিক ঘেঁষে তেড়ে আসছে। রাশিয়ান পাইলটের স্পীড হিসেব করল রানা—মাক ওয়ান পয়েন্ট সিক্স। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে বেরেনকোর, একেবারে কাছাকাছি এসে হামলা চালাতে চাইছে সে, যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা না থাকে।

ভিউ মিররে তাকে দেখতে পেল রানা। বুঝল, সিটিং ডাক হয়ে গেছে সে পিপি-টুর পাইলটের কাছে। আর বড় জোর দুই কি তিন মিনিট। তারপর হাজার টুকরো হয়ে ঝরে পড়বে পিপি-ওয়ান নিচের সাগরে।

কমলা রঙের বড়ি ছুটে এল। কামান দেগেছে বেরেনকো। এড়িয়ে যাবার জন্যে প্লেন একপাশে সরিয়ে নিল রানা। আয়নায় দেখল, কামানের গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বটে, পিছু ছাড়েনি পিপি-টু। ঠিক একই অবস্থানে থেকে অনুসরণ করছে ওকে। পিপি-ওয়ানের হিট-সোর্সের একেবারে কাছে চলে আসতে চাইছে বেরেনকো। হাতে আর মাত্র একটা মিসাইল রয়েছে—শিওর হয়ে মারতে চায়।

হঠাৎ বুদ্ধিটা খেলে গেল মাথায়। আকাশ-যুদ্ধের সমস্ত নিয়মের বাইরে একটা কাজ করে বসল রানা। যেন বাম দিকে সরে যাচ্ছে এমনি একটা ভঙ্গি করেই সাথে সাথে ফিরে এল আগের কোর্সে, হঠাৎ কমিয়ে দিল স্পীড, এবং রিয়ারওয়ার্ড ডিফেন্স পড থেকে শেষ ডিকয় হিট সোর্সটা ফায়ার করল।

ফাইনাল কিল্-এর জন্যে একেবারে কাছে চলে এসেছিল বেরেনকো। পিপি-ওয়ানকে বামে সরে যেতে দেখে সে-ও বামে সরতে গেল, কিন্তু সামনের প্লেনটা যত দ্রুত আগের কোর্সে ফিরে এল তত দ্রুত ডানদিকে সরতে পারল না—ফলে সরাসরি পেছনে পড়ে গেল রানার। ঠিক এটাই চেয়েছিল রানা, ডিকয় হিট সোর্সটা

ছেড়েই বুঝতে পারল কাজ হয়েছে।

উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। পিপি-ওয়ানের পেছন থেকে বেরিয়ে শূন্যে ঝুলছে গোলাকার অগ্নিকুণ্ড।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিপি-টুর বিশাল ইনটেক গিলে নিল রানার ফায়ার করা ডিকয় অগ্নিকুণ্ড—এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

শক-ওয়েভ টের পেল রানা। দিক পরিবর্তন করল দ্রুত। রিয়ার মিররে চোখ রেখে দেখল পেছনে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী, তার ভেতর থেকে ঝরে পড়ছে পিপি-টুর হাজারটা টুকরো অংশ, কোন কোনটা ঝিক করে উঠছে রোদ লেগে। অনেক নিচে সুনীল সাগর।

এতক্ষণে টের পেল রানা, সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। কেমন যেন বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার আগেই চট্ করে কোর্স ঠিক করল ও, তারপর অটো পাইলটের সুইচ অন করে দিয়ে চোখ বুজে এলিয়ে পড়ল সীটের ওপর। অন্তত বিশটা মিনিট বিশ্রাম নিতেই হবে ওকে।

পথে আর কোন ঝামেলা হয়নি। মাঝপথে একাধিকবার নিরাপদে ফুয়েল সাপ্লাই পেয়েছে রানা। শেষ বিকেল নাগাদ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ল্যান্ড করল মিকোয়ান মিগ-৩১, আজ পর্যন্ত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফাইটার প্লেন।

ককপিট থেকে নামল রানা। প্রচণ্ড একটা চমক অপেক্ষা করছে ওর জন্যে, জানত না। স্বয়ং মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান রিসিভ করতে এসেছেন ওকে!

যা কোনদিন করেনি, আজ অন্তরের উথলে ওঠা তাগিদ উপেক্ষা করতে না পেরে, ঝুঁকে পড়ে বুড়োর পা ছুঁয়ে সালাম করল রানা।

রানার এই অপ্রত্যাশিত আচরণের জন্যে তৈরি ছিলেন না রাহাত খান, তাঁর চেহারা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠল। ‘এসো, জরুরী কথা আছে,’ বলে দ্রুত পিছন ফিরলেন রানার দিকে। চোখের পানি লুকাবার জন্যই কি!

টারমাকের ওপর দিয়ে একটা অ্যামফিবিয়ান প্লেনের দিকে হাঁটছেন রাহাত খান। তাঁকে অনুসরণ করছে রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল ও। এয়ারকিংকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সশস্ত্র আর্মি গার্ড এবং বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অনেক লোকজন। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশী, হাত-কাটা সোহেল আর শাড়ি পরিহিতা সোহানাকেও দেখতে পেল রানা। চোখাচোখি হতে হাত নাড়ল ও।

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। সোহানা ওভাবে কেন হাত নাড়ল? যেন বিদায় জানাচ্ছে ওকে!

ইতোমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছেন রাহাত খান। ছোট্ট প্লেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি, ফিরলেন রানার দিকে। ‘মস্কো মেনে নিয়েছে আমাদের বক্তব্য। ওই দেখো ওদের লোক। ঢাকা থেকে মিগ-৩১ ডেলিভারি নেয়ার জন্যে রওনা হয়ে গেছে ওদের পাইলট। কিন্তু...’

‘স্যার...’

রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মেজর জেনারেল বললেন, ‘কিন্তু চারদিক থেকে খবর আসছে, সি.আই.এ. এবং জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স রেড সিগন্যাল ফ্ল্যাশ করছে—টার্গেট তুমি। লন্ডন, অ্যামস্টারডাম, প্যারিস, ওয়াশিংটন, সবগুলো বড় বড় রাজধানী থেকে রিপোর্ট পেয়েছি আমি—দুটো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি তাদের প্রত্যেক এজেন্টকে একটাই নির্দেশ পাঠাচ্ছে, সমস্ত কাজ ফেলে যেভাবে পারো খুঁজে বের করো মাসুদ রানাকে। নির্দেশের নমুনা কপিও পেয়েছি আমরা, তাতে তিনবার শুধু একটাই কথা

লেখা আছে: কিল হিম, কিল হিম, কিল হিম।'

চুপ করে থাকল রানা। ভেবেছিল বাড়ি ফিরে ডাল-ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম নেবে, তারপর অফিসে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে চুটিয়ে...

'আমরা যে-কোন মুহূর্তে কমান্ডো হামলা আশঙ্কা করছি ঢাকা এয়ারপোর্টে,' আবার বললেন রাহাত খান। 'এখানে এক মুহূর্ত থাকাও তোমার জন্যে নিরাপদ নয়। ক্ষ্যাপা কুকুর হয়ে গেছে ওরা, এই মুহূর্তে তোমাকে প্রোটেকশন দেয়া বি.সি.আই-এর পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমাকে কি করতে হবে, স্যার?' শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সেটা তুমিই ঠিক করবে। আপাতত গা ঢাকা দিতে হবে তোমাকে। তিনমাস ছুটি। আমি এদিকটা দেখছি। তুমি কোথায় যাবে, ঠিক করো। কেউ জানবে না কোথায় গেছ, এমন কি আমিও না।' ইঙ্গিতে প্লেনটা দেখালেন। 'এটা তোমার জন্যেই তৈরি হয়ে আছে। কিছু নকল পরিচয়-পত্র আছে ওতে, হয়তো কাজে লাগাতে পারবে। কিছু ফরেন কারেন্সিও আছে। টাওয়ারকে বলা আছে, এই মুহূর্তে টেক-অফ করবে...'

'কিন্তু, স্যার, এভাবে...'

খেপে গেলেন বৃদ্ধ। 'যা বলছি করো, তর্ক কোরো না। প্রতি মুহূর্তে বিপদ বাড়ছে আমাদের সবার। দয়া করে এবার রওনা হয়ে যাও...গেট লস্ট!'

রাহাত খান নিজেই ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর গমন পথের দিকে বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে প্লেনের সিঁড়ির দিকে এগোল। চিন্তার ভারে নুয়ে আছে মাথা।

***